জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জন্ম ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ মৃত্যু ঃ ১০ নভেম্বর ১৯৮৩

বুলেটিন নং ৩৭ ॥ ১৬ বর্ষ ॥
১০ নভেম্বর ২০০৬

এম এন লারমার ২৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী
ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ নভেম্বর '৮৩ অমর হোক

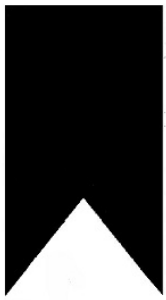

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন JUMMA SAMBAD BULETIN

প্রকাশকালঃ
১০ নভেম্বর ২০০৬

Published on:
10 December 2006

প্রকাশনায়ঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Published by:
Department of Information and Publicity
Parbatya Chattgram Jana Samhati Samiti

যোগাযোগঃ
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
কেন্দ্রীয় কার্যালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

Contact:
Department of Information and Publicity
Central Office
Parbatya Chattgram Jana Samhati Samiti
Kalyanpur, Rangamati
Chittagong Hill Tracts, Bangladesh

টেলিফোন ও ফ্যাক্সঃ +৮৮০-৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইলঃ pcjss@hotmail.com
pcjss@gmail.com
pcjss.org@gmail.com

Tel & Fax: +880-351-61248
E-mail: pcjss@hotmail.com
pcjss@gmail.com
pcjss.org@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্যঃ ৩৫.০০ টাকা

Price: TK. 35.00 only

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর পরিবেশ ভাবনা	লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা	৫
মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা	জ্যোতিপ্রভা চাকমা	৮
শংখ নদী তীরে যেন জীবনের গান শুনতে পাই?	সঞ্জীব দ্রং	১২
A Glowing Tribute To A Leader	Mong Sa Nu	১৫
কিছু স্মৃতি	প্রিয়দর্শী খীসা	১৭
এম এন লারমা আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং মুক্তির প্রতীক...	পি বি কার্বারী	২০
তোমার বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গে আলোকিত হোক ধরণী	সুদীর্ঘ চাকমা	২১
আদিম বর্বরতা ও আধুনিক বর্বরতা	নীলিমা চাকমা	২৩
ছাত্র সমাজের প্রতি	মিলিন্দ মারমা	২৪

কবিতা

❑ আমি চাই	পি বি কার্বারী	২৫
❑ পথের দিশা দিলেন যিনি	শ্যামল তালুকদার	২৫
❑ এশিয়ার মাটি	মৃত্তিকা চাকমা	২৬
❑ স্মৃতি সৌধ	জ্যোতিপ্রভা চাকমা	২৬
❑ স্মৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি	জড়িতা চাকমা	২৬
❑ কালো ডায়েরী	পপেন ত্রিপুরা	২৭

বিশেষ প্রতিবেদন

❑ বন বিভাগের ইকো-পার্ক ও সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফলে ম্রো গ্রামবাসীরা উচ্ছেদের মুখে	২৮
❑ বান্দরবানের চার গ্রামের বম জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ আতঙ্কে ভূগছে	২৯
❑ সাম্প্রদায়িক শিক্ষার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আলোকিত মানুষ হতে হবে - জে বি লারমা	৩০
❑ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা	৩১
❑ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল ঃ এক নজরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার চিত্র	৩২
❑ কাপ্তাইয়ে কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে অতর্কিতে বর্বরোচিত পুলিশী হামলা, চাঁদাবাজি ও লুটপাট	৩৪

সংবাদপ্রবাহ ৩৫

সম্পাদকীয়

১০ ই নভেম্বর '৮৩ জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে শোকাবহ দিন। এদিনে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের দুর্বার আন্দোলনের স্রষ্টা, মেহনতী মানুষের পরম বন্ধু, মুক্তিকামী সংগ্রামী গণমানুষের কণ্ঠস্বর তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার ৮ জন সহযোগীসহ বিভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্রে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। এই শোকাবহ দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মহান নেতা এম এন লারমাসহ বীর শহীদদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে বীর শহীদদের পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি, সকল লড়াকু সহযোদ্ধাদের প্রতি যারা শত্রুর হাতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, জেলে অন্তরীণ হয়েছেন, অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করছেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র গৃহযুদ্ধের অবতাড়না করেছিল এবং মহান নেতাসহ অনেক বীর বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। সেই একই কায়দায় চার কুচক্রীর উত্তরসূরী হিসেবে জুম্ম জাতীয় জীবনে হাজির হয়েছে ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী চক্র। তারা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের প্রেতাত্মা হয়ে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে গলাটিপে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আর ইউপিডিএফ নামধারী এই সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে শাসকগোষ্ঠীসহ সেনাবাহিনীর একটি অংশ অব্যাহতভাবে মদত দিয়ে চলেছে যাতে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ধ্বংস হয়।

বর্তমানে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে চলছে এক কঠিন সংকট। সংকটের মধ্য দিয়ে চলমান পরিস্থিতিতে আজ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখে বিরাজ করছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না বরঞ্চ জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র জোরদার করা হয়েছে। অপরদিকে '৮৩ সেই বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের অনুগামী ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। এমনিতর এক কঠিন পরিস্থিতিতে ১০ই নভেম্বরের চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়ে সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদপন্থী চক্রান্ত নির্মূল করা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই '৮৩ গৃহযুদ্ধের মতো গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইউপিডিএফের সকল সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতা সমূলে উৎপাটন করা আশু করণীয় হয়ে পড়েছে।

আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। জুম্ম জনগণের চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে যাবেই। বিগত সময়ে অধিকারকামী সংগ্রামী জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির আপোষহীন নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। গৃহযুদ্ধের মতো কঠিন প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকেও সমূলে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তাই ইস্পাত-কঠিন ঐক্য ও দৃঢ়তায় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নিতে হবে।

দেখতে দেখতে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো। বিগত সময়ে চারদলীয় জোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোনরূপ ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার বিপরীতে কালক্ষেপণ ও চুক্তি লংঘন করেছিল। আজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পরও জুম্ম জনগণের মনে এখনো আস্থা সৃষ্টি হয়নি যে, তারা গণতান্ত্রিক শাসনের স্বাদ পাবেন; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পথে এগুবেন। বরং এখনো সকল প্রকার বঞ্চনা, নিপীড়ন ও জাতিগত নির্মূলীকরণের তৎপরতা বহাল তবিয়তে চলছে। জুম্ম জনগণের উপর আজও অপারেশন উত্তরণ'র নামে সামরিক শাসনের স্টীম রোলার আর তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলন নামধারী সাম্প্রদায়িক মহলের দৌরাত্মে পার্বত্যবাসী এখনো হুমকীর মুখে। জুম্ম জনগণ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছেন আর পরিণতিতে ভূমিহীন ভাসমান জীবনযাপন করছেন। দেশবাসীর দৃষ্টি এখন আসন্ন সাধারণ নির্বাচন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি নিবদ্ধ। আমরা আশা করবো তত্ত্বাবধায়ক সরকার সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে পার্বত্যবাসীর মনে আস্থা সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসবে। পার্বত্যবাসী যেন অবাধে ও নিশ্চিন্তে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে; তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারে সে পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্তরিক হবেন। মানবতাবাদী ও বিবেকবান মানুষ আজ এটাই কামনা করে। ♦

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তাঁর পরিবেশ ভাবনা

লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা

১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে আমি বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে আমার কর্মস্থল ৫নং সেক্টর হতে নুতন কর্মস্থল কাচালং জোনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। দীর্ঘ ৫ দিন পাহাড়-ছড়া-নদী পথ অতিক্রম করে মাইনী রিজার্ভ ফরেষ্টের ধনপাতা হেডকোয়ার্টারে পথ-ক্লান্তি নিয়ে যখন পৌছি, তখন আমাদের প্রিয়নেতা এম এন লারমা অন্যান্য সহযোদ্ধাদের নিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সাদরে বরণ করে নেন। অনেক দিন পরে দেখা। আমাদেরকে হালকা নাস্তাসহ পাতি লেবুর সরবত পরিবেশন করা হয়। কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রিয়নেতা অতিথি দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যকে অতিথিশালায় আমদেরকে নিয়ে যেতে বললেন। বলাবাহুল্য এর আগে দেখা-সাক্ষাৎ এবং দু'তিন দিনের বেশী নেতার সাথে অবস্থান ও ভাব বিনিময় করার সুযোগ হয় নাই। তবে এবারের দেখা সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় এবং বিশেষ করে প্রিয়নেতাকে নুতন করে চেনার সুযোগ হয়, যা প্রিয়নেতার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আরো একটি নুতন দিকের সাথে পরিচিত হয়ে প্রকৃতি, জীব পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেকে পরিচিত করার এই প্রথম পাঠ নিলাম। একজন রাজনৈতিক কর্মী তার রাজনৈতিক পরিমন্ডলেই আবদ্ধ থাকবেন এমন নয়; তাকে তাঁর কর্মপরিমন্ডলকে প্রকৃতি, জীব পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় – এই শিক্ষা আমি ধনপাতার হেডকোয়ার্টারে প্রিয়নেতার সাথে অবস্থান করে অর্জন করি। প্রিয়নেতাও ছিলেন পরিবেশবাদী। শিক্ষাগুরু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কাছ থেকে এই শিক্ষা অর্জন করি। তারই কিছু স্মৃতি কথা আজ তুলে ধরছি।

হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতেই আমি একটু অবাক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলাম। রিজার্ভ ফরেষ্টের ভেতরেই হেডকোয়ার্টারের অবস্থান। যেই কয়েকটা ব্যারেক নিয়ে আমাদের হেডকোয়ার্টার, তার চতুর্দিকে আনুমানিক ৫/৬ হাত দূরে যেতেই এক/দেড় ফুট উঁচু ছোট চারা গাছে ভরা এবং গাছ ও গাছের শাখা-প্রশাখার পাতায় সবুজের চাল ছাওয়া। আকাশ প্রায় দেখা যায় না। শুধু পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো হাসে। আমি ভাবলাম, কেমোপ্লাজ ও কনসিলম্যান্টের জন্যই বোধ হয় ব্যারাকের চারিদিক ছোট ছোট চারা গাছের ঝোপঝাড়গুলো পরিস্কার করা হয় না।

সুদীর্ঘ পথ হাঁটার শ্রান্তিতে বোধ হয় রাতে একটু বেশী ঘুমিয়েছিলাম। সকালে জেগে উঠে বসতেই দেখি ব্যারাকের ভিতর কেউ নেই। সবাই যার যার কাজে চলে গেছেন। নিয়মবদ্ধ গেরিলা জীবনে ব্যতিক্রম করে সেদিন একটু বেশী ঘুমিয়েছিলাম। হয়তো আমাদের শারীরিক ক্লান্তির কথা ভেবে সাথী-বন্ধুরা আমাকে একটু বেশী ঘুমোতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। বাইরে বাঁশের তৈরী বেঞ্চে বসতে না বসতে দেখলাম দু'টো মথুরা পাখী নিবিড় মনে মাটি আঁছড়ে আঁছড়ে খাদ্য খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে। গাছের উপরে নানা রঙের পাখীর কিচির মিচিরের ডাকে বনের নিস্তব্দতার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে। কি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ! যেন শান্তিবাহিনী পশু-পাখি, ছড়া-ছড়ি, গাছ-বাঁশের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান। যেন কেউ কারোর শত্রু নয়। এ এক অভয়ারণ্য। প্রায় একমাস সময় ধরে হেডকোয়ার্টারে অবস্থানকালীন সময় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত হওয়া পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর এই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের দৃশ্য দেখে দেখে আমি নিজেকেও এই পরিবেশের মাঝে হারিয়ে ফেলতাম। বুনোমোরগ-মুরগী, মথুরাগুলো চড়তে চড়তে ব্যারাকে মাচার (বাঁশের মাচাং যার উপর শুঁয়ে আমরা ঘুমাই) নীচে পর্যন্ত চলে আসতো। গাছের উপর হরেক রকমের ছোট-বড় পাখি সারাটা দিন যাওয়া-আসা করছে। তাদের মধ্যে ধনেশ পাখিরা আসছে-যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির পাখীরাও আসা-যাওয়া করছে। বানরের দল ব্যারাকের কাছে-পিছে ঘুরে ফিরে গাছের কচি পাতা খাচ্ছে। হরিণ-হরিণীরা স্বভাবজাতভাবে ডেকে উঠেছে ব্যারাকের ১৫/২০ হাত দূরে। শীতের গভীর রাতে বাঘের ডাক শোনা যায়। সকালে দেখা যায় বড় হরিণ ও বাঘের পায়ের ছাপ; ব্যারাকের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছড়ার পাড়ে পাড়ে।

ধনপাতার রিজার্ভ ফরেষ্টের হেডকোয়ার্টার কেন্দ্রীক অভয়ারণ্যের বিরল দৃশ্য সম্বলিত অভিজ্ঞতা প্রত্যেক দিন এখানকার ষ্টাফ সদস্যদের কাছে জেনে নিতাম। তাঁদের কাছে মানুষ ও পশু-পক্ষীর এই সহঅবস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে তাঁরা প্রত্যুত্তরে বলতেন যে, এর মূলে রয়েছেন আমাদের প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ধনপাতায় হেডকোয়ার্টার স্থাপনের পর পরই তিনি সকলকে ক্লাশ করে বনের মধ্যে অবস্থান করার নিয়ম-কানুন বুঝায়ে দেন এবং সেগুলো যথযথভাবে মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেন। সামরিক দিক যা অবশ্যই পালনীয় এবং পাহাড়-ছড়া-ঝর্ণা-গাছ-বাঁশ-পশু-পাখী-মানুষ নিয়ে প্রকৃতির সেই নিয়ম-কানুন তা সকল সদস্যের অবশ্যই পালনীয় ছিল। তিনি বলতেন যে, সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলাদি না মানলে যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ সৈন্যদলকে আত্মরক্ষা করা যায় না, তেমনি প্রকৃতির নিয়ম-কানুন না মানলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। তাই তিনি চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ, শব্দ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সবকিছু মেনে চলতে সবাইকে বলতেন।

তিনি বলতেন যে, বন হচ্ছে পশু-পাখীদের আবাসভূমি। আমরা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্বের লড়াই করতে পশুপাখীদের আবাসভূমিতে আশ্রয় নিয়েছি। কাজেই পশু-পক্ষীদের নিধন করা যাবে না। তাদেরকে নিয়েই একসাথে থাকতে হবে।

অপ্রয়োজনে গাছ-বাঁশ কাটা যাবে না। তাদেরকে নিয়েই একসাথে থাকতে হবে। চাকমা ভাষায় একটা কথা আছে "পধঅ' হুরে গাছ ন' অইয়ো" অর্থাৎ পথের ধারের গাছ হইও না। কেননা পথচারীর হাতে দা থাকলে আসা-যাওয়ার সময় পথচারী শুধু শুধু পথ-পাশে স্থিত গাছের গায়ে কোপ বসিয়ে দেয়। এজন্যে তিনি পথের ধারের গাছ কাটতে বারণ করতেন।

একবার ছড়ায় জাল দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। খুঁজে পাওয়া গেল অসংখ্য ব্যাঙাচির আস্তানা। জাল দিয়ে সকলের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ব্যাঙাচি ধরার পর তিনি আর ব্যাঙাচি ধরতে দিলেন না। বললেন, "অবশিষ্টগুলো পরে ধরে খাওয়া যাবে। অথবা এদের থেকে আরো ব্যাঙাচি হলে খাওয়া যাবে।" কাঁকড়াগুলো রাতের বেলায় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে খাদ্যের সন্ধানে। আমাদের শান্তি বাহিনীর সদস্যরা নাইট মার্চিং-এর সময় ছড়াপথে কাঁকড়া ধরে দাঁড়গুলো ভেঙ্গে নিয়ে ব্যারাকে পৌঁছে আগুনে পোড়ায়ে শাঁসগুলো খেতো। প্রিয়নেতা তা বারণ করতেন এবং বলতেন, "তোমাদের হাতগুলো কেটে নিলে তোমরা কিভাবে আহার করবে?" তাছাড়া তিনি রাতের বেলায় ঘনঘন কাকঁড়া ধরতে বারণ করতেন। রাতের বেলায় কাঁকড়াগুলো গর্তের বাইরে আসে বলে সহজে মানুষের হাতে ধরা পড়ে এবং কয়েকদিনের মধ্যে ঐ ছড়ায় আর কাঁকড়া পাওয়া যায় না। এজন্য কাঁকড়াগুলোর অস্তিত্বের কথা ভেবে রাতের বেলায় একই ছড়াই ঘনঘন কাঁকড়া ধরতে নিষেধ করতেন।

একবার বড় একটা মোন 'দুর' (বড় বিরল প্রজাতির বড় কাছিম। কাছিমটি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোককে অনায়াসে পিঠে করে বহন করতে পারে) ব্যারেকের পাশের গ্রামের লোকেরা পেয়েছিল। আমাদের ডাঃ সুমেন্ত গ্রামে রোগী দেখতে গিয়ে গ্রামের লোকদের কাছ থেকে সে খুব কষ্টে পিঠে করে ঐ 'দুর' নিয়ে এসেছে। দুর'টা পিঠের উপর থাকা অবস্থায় দুর'টার অপর দিক হতে দিক থেকে ডাঃ সুমেন্তকে দেখা যাচ্ছিল না। দুর'টাসহ ডাঃ সুমেন্ত ব্যারাকে পৌঁছলে হেডকোয়ার্টারের সকল সদস্য মহাখুশীতে আত্মহারা। সকলের জন্য সেটা একটা মুখরোচক দুর্লভ খাদ্যবস্তু। প্রিয়নেতার কাছে এই খবরটা পৌঁছলে তিনি মোন দুর'টাকে দেখতে আসলেন এবং সবাইকে বললেন, "দেখো, এই দুরগুলো হলো এখন বিরল প্রজাতির। পৃথিবী হতে এরা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এদের সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য।" শেষে তাঁর কথা শুনে এই কচ্ছপ আর খাওয়া হলো না। অতএব ব্যারাকের ছড়ার মাথায় গিয়ে দুর'টাকে ছেড়ে দিতে হলো। আর প্রিয়নেতার নির্দেশে প্রাণীটির পিঠের উপর লিখে দেয়া হলো মুক্তি লাভের সন। কারণ এই কচ্ছপগুলো নাকি একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী জোড়াবদ্ধ হয়ে কাছাকাছি থেকে আহারের জন্য ঘুরে-ফিরে থাকে।

আরেকবার জুমে শিকার করতে গিয়ে একটা হরিণ পাওয়া গেল। আর তাতেই হলো বিপত্তি। হরিণটা ছিল মাদী। হরিণ শিকার করা যাবে। কিন্তু মাদী হরিণ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। আমার মতো ধনপাতার হেডকোয়ার্টারে ১৯৭৯ সালে সফর করেছিলেন আমাদের অন্য আরেকজন প্রিয়নেতা কহ্লাউ ভান্তে। তিনি সংসার সর্বস্ব ত্যাগী ধর্মীয় নেতাও। আমৃত্যু তিনি দেশ-জাতি-সমাজের জন্য কাজ করে গেছেন। সেখানে সফরকালে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ৫নং সেক্টরে এসে আমদেরকে বলেছিলেন। একদিন এক বিষধর সাপ ব্যারাকে চালের নীচে (বাঁশের তৈরী চালার ফ্রেম) জড়িয়ে আছে এবং একেবারেই আমাদের নেতার বিছানার উপরে, যেদিকে তিনি মাথা রেখে ঘুমান। এই সাপকে মারার জন্য সকলে লাঠিসোটা হাতে নিয়ে হাজির। কিন্তু তিনি এই সাপটাকে মারতে দিলেন না। তিনি বললেন, "সাপকে ক্ষতি বা আঘাত না করলে বা ভয় না দেখালে সাপ সহজে কাউকে কাটে না। সাপ আপনী থেকেই চলে যাবে।" হয়েছিলও তাই। সাপটি আপনা আপনীই কাউকে ক্ষতি না করে সরে যায়। প্রাণীর প্রতি আমাদের প্রিয়নেতা অকৃত্রিম ভালবাসা ও এদের সংরক্ষণের মনোভাবকে কহ্লাউ ভান্তে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং বলতেন যে, তিনি একজন সংসারী হয়েও তাঁর (ভান্তের) চেয়ে বেশী শীল (নীতি) রক্ষা করতেন।

পরিবেশবাদী প্রিয়নেতা এম এন লারমা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত নয়, বরং তা তিনি যৌথ জীবনে এবং জাতীয় জীবনে জীব পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষার নীতি মেনে চলার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। ১৯৭৫ সালে হেডকোয়ার্টারের একগুচ্ছ নির্দেশাবলী সাব-জোন, জোন ও সেক্টরের মাধ্যমে সকল সামরিক-বেসামরিক কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয় যে, নির্দেশ প্রাপ্তির পর হতে কেউ ধনেশ পাখী, বিরল প্রজাতি পাখী, মাদী হরিণ, বাঘ, ভল্লুক, গয়াল, হাতী, অজগর, কোবরা, শক্‌জোড় (বিষধর বড় সাপ), বানর, জংলী কুকুর, বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, বনরুই, ইয়ো হরিণ (খাড়া পাহাড়ে এই প্রজাতির হরিণ থাকে) ইত্যাদি পশু-পাখীদের সংরক্ষণ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কমিটিকে (সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালীন গ্রাম ভিত্তিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন। এই কমিটির মাধ্যমে গ্রামের সকল ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করা হতো) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। পশুদের মধ্যে কেবলমাত্র শুকর শিকারের উপর কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। প্রথমতঃ শুকরের বংশবৃদ্ধির হার বেশী। দ্বিতীয়তঃ শুকর জুম ও জমির ফসল বেশী নষ্ট করে। কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকা মোটাসুতার জাল দিয়ে ঘেরাও করে পশু শিকারও নিষিদ্ধ ছিল।

প্রত্যেক বছর ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে জুম চাষের জুম পোড়ানোর সময় এবং রাখালরা নতুন ঘাস গজানোর জন্য জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে প্রত্যেক বছর শত শত একর বনভূমি আগুনে পুড়ে উজার হয়ে যেতো। প্রকৃতির উপর এরকম আঘাত ভবিষ্যতে কি ধরনের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে দূরদর্শী প্রিয়নেতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে অপ্রয়োজনে বনজঙ্গল পোড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭৫ সনে। ঐ নিষেধাজ্ঞায় বলা হয় যে, জুমচাষীরা প্রত্যেক বছর জুম চাষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় জুম কাটবেন এবং জুম পোড়ানোর সময় সকলে মিলে একসঙ্গে বাতাসের গতি দেখে জুম পোড়াবে। জুমের

এলাকার বাইরে আগুন ছড়িয়ে পড়লে চাষীরা সকলেই একসাথে আগুন নেভাবে। ফলে বনজঙ্গল পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ এসে যায় এবং এর সুফল জনগণ বুঝতে পারে। দেখা গেছে পোড়া-ন্যাড়া পাহাড়গুলোতে অনেক নতুন বনভূমি সৃষ্টি হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পার্বত্য অঞ্চলে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষার জন্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কর্মীবাহিনী ও জনসাধারণকে সচেতন করেছিলেন।

সশস্ত্র আন্দোলনের সময় রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য এম এন লারমা শান্তিবাহিনী সদস্যদের নির্দেশ দেন। কিন্তু একটা সময় এই বনজ সম্পদ রক্ষা করা দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালীদের দ্বারা সংঘটিত কতগুলো গণহত্যার পরে পাহাড়ের হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং জুম চাষের উদ্যোগ নেয়। এ রকম পরিস্থিতিতে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে এই বনজ সম্পদ রক্ষা করা হয়। সেই সময় বন বিভাগের লোকজন ভয়ে বনজঙ্গলে ঢুকতো না। বলা যায় এম এন লারমার দূরদর্শী নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতিই সেই রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল রক্ষা করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই হ্রদের বাঁধ এই এলাকাবাসীদের জন্য মরণ ফাঁদ এ বিষয়টা ১৯৫৮-৫৯ সনে দূরদর্শী ও পরিবেশবাদী আমাদের প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতো বোধ করি কেউ গভীরভাবে উপলব্দি করতে পারেন নাই। এমনকি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোন বুদ্ধিজীবী, পরিবেশবিদ, রাজনীতিক কেউই প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেননি। বর্তমান সময়ে উত্তর বঙ্গের ফুলবাড়ী কয়লা খনির পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে দেশের সকল স্তরের মানুষ প্রতিবাদ করছে সেভাবে তৎসময়ে কেউই এগিয়ে আসেনি। একমাত্র এম এন লারমাই এই কাপ্তাই বাঁধের ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি জীব পরিবেশজনিত ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কথা লিখিতভাবে প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে কোন জুম্ম প্রতিবাদ করেনি এবং তার পেছনে দাঁড়াতে সাহস করেনি। তিনি অকুতোভয়ে সমস্ত বিপদকে মাথা পেতে নিয়ে হিমালয়ের মতো বড় ও জঘন্য হিংস্র ইসলামপন্থী পাকিস্তান সরকারের মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পাকিস্তান সরকার শুধুমাত্র এই একজন জুম্ম বীরকে বাইরে রাখতে এতোই ভীত সন্ত্রস্থ হয়েছিলো যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে গ্রেফতার করে জেলে অন্তরীণ করে রেখেছিলো। তথাকথিত ভীরু জুম্ম নেতারা শিয়ালের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ছাগলের মতো দাঁড়িয়েছিল। যেদিন তিনি জেল থেকে মুক্তি পান সেদিনও তাঁকে বরণ করে নেয়ার জন্য কোন জুম্ম নেতা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও চাকুরীজীবী কেউ ছিল না। সেদিন চট্টগ্রামের জেএম সেন হলে এই জুম্ম বীরকে বীরের মর্যাদা দিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করেছিলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবী বন্ধুরা।

মানুষ নিজেদের শারীরিক চাহিদা পূরণ করার জন্য আদিম যুগে প্রকৃতির বুকে খাদ্য সংগ্রহ ও বন্য প্রাণী শিকার করেছে। পরবর্তী কালে মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ অর্থাৎ শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তুগুলো নিজেদের উপযোগী তৈরী করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে এসেছে। কিন্তু মানুষের অসচেতন এই উৎপাদনী কার্যকলাপ প্রকৃতির ক্ষতি সাধন করে থাকে। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের বৈরী সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাই প্রকৃতিও মানুষের উপর এর প্রতিশোধ নেয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, প্লাবন, সাইক্লোন, মহামারী ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকৃতি মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয়। গত ২০০৫ সনে কয়েক মিনিটের সুনামীর জলোচ্ছাসে লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। ভেঙ্গে গিয়েছিল মানুষের তথাকথিত আধুনিক সৃষ্টির সংস্কৃতি। পরিবেশবাদী এম এন লারমা প্রকৃতি ও তার অন্যতম অংশ মানুষের সমাজের সেই নিবিড় সম্পর্ক তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতেন এবং পরস্পর নির্ভরশীল ইতিবাচক সম্পর্ক প্রকৃতির ক্ষতি না করেই গড়ে তোলার একজন কারিগর ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের এই দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলন থেকে প্রাকৃতিক জৈব পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। এখানেই তাঁর সাথে অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মৌলিক পার্থক্য। তিনি শুধু রাজনীতিবিদ নন, পরিবেশবিদও ছিলেন।♦

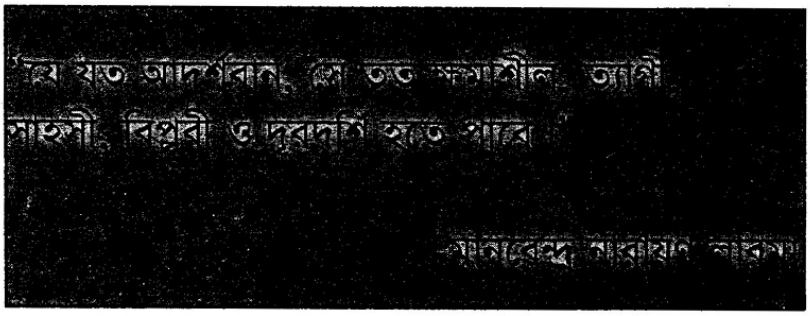

মঞ্জু'র কিছু স্মৃতি কিছু কথা

জ্যোতিপ্রভা চাকমা

আমাদের পরিবার

আমাদের ঠাকুরদাদা চানমুনি চাকমা ও তাঁর অন্যান্য ভাইদের বাসস্থান ছিল প্রথমে 'কেরেতকাবা' নামক স্থানে, মাউরুম ছড়ার উৎপত্তিস্থল সত্তা-ধ্রুং এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে। পরে দাদুরা চলে আসেন এই মহাপুরমে। বাবারা তিন ভাই। সবার বড় কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ; মেঝোভাই হরকিশোর চাকমা, তখনকার সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন; আর সবার ছোট চিত্ত কিশোর চাকমা, আমাদের পিতা। আমাদের মায়ের নাম সুভাষিণী দেওয়ান, খাগড়াছড়িস্থ খবংপয্যা গ্রামের রমেশ চন্দ্র দেওয়ানের জ্যেষ্ঠ কন্যা। আমার তিন ভাই যথাক্রমে- শুভেন্দু প্রভাস লারমা (বুলু), মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু), সবার ছোট জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) আর আমি সবার বড় বোন জ্যোতিপ্রভা লারমা মিনু। আমি মঞ্জুকে আদর করে ডাকতাম 'চিক্ক' বলে।

আমাদের বাড়ি ও মঞ্জু'র শিশুকাল

আমাদের বাড়িটির নাম ছিল 'অনোমা কুঠির', বাবারই দেয়া নাম। বাড়িটি মাটির তৈরী 'গুদোম', ছনের ছাউনি, দোতলা। বাড়িটিতে রয়েছে বড় বড় সাতটি ঘর। ঘরের ভিতরে বাবা দোলনা টাঙিয়ে দিতেন। এই বাড়িটিতেই আমাদের জন্ম। বাবার কল্পনা বা আকাঙ্খা ছিল তাঁর তিন ছেলে হবে অনেকটা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মত, আর মেয়ে হবে প্রকৃতি।

আমাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিলো। জমিতে ধান আর শাক-শবজির চাষ হতো। বাগান-বাগিচা ছিলো। গোলাভর্তি ধান থাকতো। বার্ষিক খোরাক-এর কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্তও থাকতো। আমাদের বাড়িতে যে ছাত্ররা থেকে লেখাপড়া করতো তাদেরও এখান থেকেই খাওয়া-দাওয়ার খরচ চলতো। যখন থেকে স্মরণ করতে পারি তখন থেকে দেখে আসছি বাড়িতে সবসময় নানা মানুষের সমাগম। সব সময় অতিথি থাকতো।

ছোটকাল থেকে মঞ্জুর স্বাস্থ্যের গড়ন ছিল নরম। খুব ছোটকালে যখন বসে থাকতে পারে না তখন তাকে বালিশের স্তুপের মাঝে রেখে আমি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতাম। বড় হলে ঘুমোবার সময় সে বরাবর ঘুমাতো বাবার সাথে আর আমি ঘুমাতাম মায়ের সাথে। মেজোভাই বুলু আর ছোট ভাই সন্তু তারা ঘুমোতো দু'ভাই-এ একসাথে।

আমার তিন ছোট ভাইদের মধ্যে তার কতকগুলো আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে সে বেশী নিয়মানুবর্তিতার অধিকারী ছিল। তাই মঞ্জুর প্রতি বাড়ীর সবাই-এর দৃষ্টি রাখতে হতো। বাড়ীতে সে কোনকিছুই একাকী খোতো না কিংবা খাবার টেনে নিতো না। অল্পেই তুষ্ট হতো। কর্মজীবনে এসেও তার সেই চরিত্র অটুট থেকেছিল। সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার এই স্বভাবের কারণে অভুক্তও রয়েছিল বেশ কয়েকবার। সে যখন হাটি হাটি পা পা শিশু তখন সে সর্বদাই মায়ের কোল ঘেঁষে থাকতে এবং মা বাইরের কাজে গেলে তার সঙ্গে যেতে চাইতো। মা তার নরম শরীরের কথা বিবেচনায় রেখে তাকে বুঝিয়ে বাড়ীতে রেখে যাবার চেষ্টা করেতেন, যেদিন আমি বাড়ীতে থাকি। হাঁটতে চলতে তার গতি ছিল মন্থর। সে মায়ের পিছনে হেলে-দুলে চলতো। অবশ্য মাঝে মাঝে তাকে সঙ্গে না নিয়ে মায়ের কোন উপায় থাকতো না। ছোটবেলা সে ছিল সচেতন, শৃঙ্খলাপরায়ণ। তার কাজ সে রীতিমতো করতো। উচ্চ প্রাইমারীতে পড়ার সময় অন্য ভাইদের সাথে মাঝে মাঝে সেও তার সাধ্যমতো মাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করতো।

মঞ্জুর স্কুলের পাঠ ও ছেলেবেলা

বাবার উদ্যোগেই গ্রামে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছোট মহাপুরম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়', যেখানে পড়ানো হয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর ১৯৫১ সালে এটি জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়। বর্তমানে ইহা রামহরি পাড়ায় অবস্থিত 'মহাপুরম হাই স্কুল'।

ছোট মহাপুরম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মঞ্জুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তখনকার সময়ে বেশী বয়সেই শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করে। ১৯৪৮ সালেই মঞ্জু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। বাবা আর আমার সাথে গিয়েই সে স্কুলে ভর্তি হয়। তখন আমি একই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তাম। বাড়িতে মাও আমাদের পড়াতেন। মঞ্জু ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এই মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুলেই পড়াশোনা করে। এরপর রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এখান থেকেই ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে।

স্কুলে পড়ার সময়ে মঞ্জু বরাবরই লেখাপড়ায় ও আচরণে ভাল ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সহপাঠীদেরও পড়াশোনায় সহযোগিতা করত। অনেক সময় তার সহপাঠীরাও তার কাছে শিখতে আসত। বাবা যখন বাড়িতে মঞ্জুর সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্রদের পড়াতেন তখন অনেক সময় বাবা তাকে ছাত্রদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়ার ভার দিতেন।

তবে তিন ভাইয়ের মধ্যে মঞ্জু ছোটকাল থেকে শারিরীকভাবে ছিল দুর্বল, নরম প্রকৃতির, হালকা-পাতলা গড়ন। তার এই শারিরীক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে প্রায় গোটা ছাত্রজীবনে। পরে অবশ্য এর কিছুটা উন্নতি ঘটে। তবে বুলু আর সন্তু ছিল ছোটকাল থেকে চটপটে, চঞ্চল আর নানা খেলাধুলায় পারদর্শী। মায়ের স্তন্যপান ছাড়ার সাথে সাথে, ৬/৭ বছর বয়স থেকে মঞ্জু বাবার সাথে ঘুমানোর অভ্যাস করে। তখন আমি আর বুলু আলাদা আলাদা কামরায় থাকতাম। আর সবার ছোট সন্তু ঘুমাতো মায়ের সাথে।

আমরা যে স্কুলে পড়াশুনা করেছি সেটা একসময় নিম্ন প্রাইমারী হতে উচ্চ প্রাইমারীতে উন্নীত করা হলে স্কুলের পাশেই দূরাগত ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং চালু করা হয়েছিল। সেখানে বাবা গভীর রাত পর্যন্ত বোর্ডিং-এর ছাত্রদের পড়ালেখা তদারকী শেষ করে তবেই রাত ১১টা/১২টার দিকে বাড়ী ফিরতেন। আমরা সবাই ঘুমিয়ে গেলেও বাবা বোর্ডিং থেকে বাড়ীতে না আসা পর্যন্ত সে জেগে থাকতো। বাবার কাছে পড়া দেবার প্রতীক্ষায়। কোন বিষয় বুঝতে না পারলে বাবাকে অপেক্ষা করে থাকত। বাবা পৌছলে পড়া আদায় করে তবেই মঞ্জুকে নিয়ে ঘুমোতে যেতো। ছোটকাল থেকে সে ছিল শান্ত প্রকৃতির। একবার মাত্র সে বুলু ও সন্তুর সাথে গিয়ে বাবাকে না জানিয়ে পাশের গ্রামে যাত্রা পালা দেখতে গিয়েছিল।

প্রকৃতির পাঠ

মাউরুম পাড়ে ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ। ছিল প্রকান্ড প্রকান্ড বটগাছ। সেইসব বটগাছে ঘিলে লতা দিয়ে টাঙানো হতো দোলনা। অবসরে সেখানে গিয়ে দুলতো সবাই, আমরাও দুলতাম। এই দোলনা দিয়েই মাউরুম নদীর এপার-ওপারে যাতায়াত চলতো।

গ্রামেরই পাশে বড় মাউরুম নদীর উপর ছিলো বড় বড় শেকল দিয়ে তৈরী এক ঝুলন্ত ব্রীজ। তখনকার সময়ে সেটাও ছিলো এক দর্শনীয় জিনিস। আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেছে কোম্পানী কাঁচা রাস্তা। শুকনো মৌসুমে জনসাধারণের জন্য গাড়ী চলাচল হতো পঞ্চাশ দশকে। প্রথম অবস্থায় গাড়ি বলতে ছিল দুটি 'হাফবাস' আর একটি টেক্সি। প্রথম চালু করা এই টেক্সিটির মালিক ছিলেন নীহার বিন্দু চাকমা। গাড়ি চলত রাঙামাটি থেকে বুড়িঘাট বা নানিয়ারচর পর্যন্ত।

বুড়িঘাট বাজার সংলগ্ন ছিল এক সাঁওতাল পাড়া। দুর্গাপুজো এলেই শোনা যেতো তাদের ঢোল-তবলার তাল আর বাঁশির সুর। সঙ্গে ছিল নাচ। সাতদিন ধরে তারা সদলবলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠোনে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নাচ দেখাতো আর বাড়ির লোকেরা তাদের খুশীমনে দিতো টাকা আর চাল। এই সাঁওতালদের পিছে পিছে নাচ দেখতে যেতো মঞ্জুরা।

সেসময় কখনো কখনো গ্রামে বা অন্যত্র বৌদ্ধমেলা, যাত্রামেলা ও বলীখেলার আয়োজন হতো। অন্যান্য ভাইদের সাথে সেসব মেলাও দেখতে যেতো মঞ্জু। গ্রামে ঐতিহ্যবাহী গেংখুলীদের আসর বসলে সেখানেও যেতো সে। আর ৬ষ্ঠ/৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে সে বাঁশি বাজানোও শিখেছিল নিজে নিজে। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় বাড়ীর দোতলার বারান্দায় বসে পূর্বদিকে মুখ করে ফসলের মাঠ আর সবুজ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই বাঁশি বাজাতো সে

অনুকরণ নয়

ছোট কাল থেকেই মঞ্জু না বুঝে অনুকরণ করার পক্ষপাতী ছিল না। একবার স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বসেছিলাম। কাকতালীয়ভাবে শিশু শ্রেণীতে পড়া মঞ্জুর আর আমার স্থান হলো একই বেঞ্চে। আমি তাকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একভাবে লিখতে পরামর্শ দিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে সেভাবে লিখল না, লিখল নিজের মত করে।

সহিষ্ণুতা আর সরলতা

ছোট্ট মঞ্জুর সহিষ্ণুতা আর সরলতাও উল্লেখ করার মতো। মঞ্জু তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মঞ্জুসহ সব ভাইবোনরা মিলে একবার বাড়ির উঠোনে বলখেলা খেলছিলাম। এক পর্যায়ে বলটি বাড়ির উঠোন পেরিয়ে সামনের পাটক্ষেতে গিয়ে পড়ে। বলটি আনতে গেলে চার ভাইবোনের সবাই 'বলাপুক'-এর (এক প্রকার ভীমরুল) প্রচন্ড কামড়ের শিকার হই। এতে আমরা সবাই চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিই। কিন্তু মঞ্জু কিছুতেই চিৎকার করে না, কেবল মুখটা একটু কাঁদো কাঁদো চেহারা করে কামড়ে থাকা পোকাগুলোকে সরাতে থাকে।

আর একবার গ্রামে ঢুকে পড়ে এক বানর। এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে গ্রামের সব বালক আর যুবকরা মেতে উঠে দুষ্টুমিতে। সবাই তাড়া করতে থাকে বানরকে। এক পর্যায়ে বুলু, মঞ্জু, সন্তু এরাও যায় সেখানে। আর এই ফাঁকে বেচারা বানরটিও ধরা পড়ে এবং বেদম প্রহারে মারা যায় যুবকদের হাতে। এই কথাটি বাবার কানে আসে। বাবা রেগে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন ছেলেরা আসবে। যেই না ছেলেরা আসলো, কেন সেখানে গিয়েছ বলে বাবা প্রহার করতে প্রস্তুত হলেন, অমনি বড় ভাই আর ছোট ভাই বাবার এই রুদ্র মূর্তি দেখে দৌঁড়ে পালালো। কিন্তু মঞ্জু পালিয়ে গেল না, দাঁড়িয়েই রইল। ফলে সে একাই শাস্তি ভোগ করলো।

আরেকবার গ্রামের একদল বালক আর যুবক গ্রামের পাশে জাল দিয়ে হরিণ শিকারে মেতে উঠে। আর হরিণও একটা জালে ধরা পড়লো। সেই দৃশ্য দেখতে বড় ভাই বুলুর সাথে নয়/দশ বছরের মঞ্জুও উপস্থিত হয় সেখানে। সেকালে এভাবে দলবেঁধে বুনো হরিণ বা শুকর ইত্যাদি শিকার করলে অংশগ্রহণকারী সবাই মাংসের অংশ সমানভাবে ভাগ পায়। এমনকি কেউ যদি এমনিতেও দেখতে যায় তারাও ভাগ পায়। মঞ্জুরাও এক ভাগ পায়। সেই মাংসের ভাগ নিয়ে বুলু আসতে থাকে বাড়ির দিকে আর তার পেছনে পেছনে মঞ্জু। এদিকে বুলু, মঞ্জুরা ঘটনাস্থলে গেছে শুনে বাবা রেগে আছেন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বুলু তা জানতে পেরে পাতায় মোড়ানো মাংসের ভাগটা বাড়ির পাশের কলাগাছের গোড়ায় লুকিয়ে রেখে দেয়। অনেকক্ষণ পরে বাবার রাগ পড়ে গেলে তবেই সে বাড়িতে আসে আর লুকিয়ে রাখা মাংসের ভাগটি মায়ের কাছে দেয়। অপরদিকে মঞ্জু সরাসরি চলে আসে বাড়িতে আর বাবার রাগের মুখে পড়ে। বাবার সব রাগ গিয়ে পড়ে মঞ্জুর উপর। কাজেই এবারেও তাকেই একা শাসানি ভোগ করতে হলো। এভাবে আরো অনেক ঘটনা আছে যেখানে সেই শৈশবেও মঞ্জুর সরলতা, সততা আর সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠাভ্যাস আর অনুসন্ধিৎসু মন

মঞ্জু ছিল বই পোকা। সে নিশিদিন বই হাতে নিয়ে থাকতো। স্কুলের পড়ার বাইরেও গল্প বই সব সময় পড়তো। একেবারে প্রথম শ্রেণী হতে আলাদা বই পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিলো তার। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বাবা কলকাতা থেকে ডাকযোগে বিভিন্ন বই ও পত্র-পত্রিকা এনে দিতেন। পত্রিকাগুলোর মধ্যে মাসিক বসুমতি, শুকতারার নাম মনে পড়ছে। এসবই মঞ্জু গভীর আগ্রহ সহকারে পড়ত। যতই বড় হয়েছে ততই বই পড়ার প্রতি মঞ্জুর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

একবার সে যখন পড়াশোনায় মগ্ন ছিল তখন ছোট ভাই সন্তু টেনিস বল নিয়ে খেলতে খেলতে বলটি নিচের তলার শুকনো পাটভর্তি এক কামরায় বলটি ফেলে। বলটি খুঁজে না পেলে সে একটি চেরাগ জ্বালিয়ে আনল আর পাটের স্তুপের উপর রাখল। এক পর্যায়ে পাটে আগুন ধরে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্জু জানতে পারল যে, পাটে আগুন লেগেছে। কিন্তু তবু সে বই পড়া ছেড়ে দেয় না, দূর থেকে কেবল ছোট ভাই সন্তুকে বলে পাটের কামরা থেকে বের হয়ে আসতে। একদিকে মঞ্জুর বই পড়া অপরদিকে সন্তুর বল খোঁজা, অথচ কারো ভ্রুক্ষেপ নেই এদিকে আগুন জ্বলছে। শেষ পর্যন্ত আমি অবস্থা বেগতিক দেখে সন্তুকে আগুনের পাশ থেকে টেনে এনে একপাশে রেখে মাকে আর লোকজনকে খবর দিলাম। এরপর লোক এসে আগুন নিভিয়ে দিল।

রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে বোর্ডিং-এ থাকার সময়ে ছুটি পেলেই সে বাড়ি যেত। বাড়িতে গেলেও নানা বই পড়ত আর মাকে কাজকর্মে সাহায্য করত। স্কুল হতে বৃত্তি পেলেও অন্য কিছু না কিনে কেবল বই কিনত। প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই বই সংগ্রহ করতো। এভাবে নিজের সংগ্রহে ছিল তার অনেক বই-পত্র।

ডাক টিকিট আর বিভিন্ন মুদ্রা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও ছিল তার যথেষ্ট আগ্রহ। সে নানা দেশের ডাক টিকিট, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করে যত্ন করে রাখতো, এমনকি বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার রং, ডিজাইন, আকার ইত্যাদির বর্ণনা লিখে রাখতো। এভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আমলের রূপা, তামা, পিতলের মুদ্রার সংগ্রহ প্রায় দেড় কেজির মত হয়েছিলো।

উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও নানান বিষয়ে তার জানার আগ্রহ ছিল লক্ষ্য করবার মত। ছাত্রাবস্থায় গ্রামের নেতৃস্থানীয় নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ পেলে সুযোগ মতো তাদের সাথে নানা বিষয়ে আলাপ জুড়ে দিত। অনেক বিষয় জানতে চাইত। সমাজ, সংস্কার, রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইত। চাষাবাদ সম্পর্কে, গাছ-বাঁশের নাম, লতাপাতার নাম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানতে চাইত। বিয়ে অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি, সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে নানা রীতিনীতির খুঁটিনাটি প্রশ্ন করত। আসলে বাল্যকাল হতে তার জানার স্পৃহা ছিল না প্রবল।

ছাত্রজীবন ও সংগ্রামের সোপান

গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করে মঞ্জু রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। সেখানে সরকারী হোষ্টেলে থেকে এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে চলে যায়। রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকার সময় সে একবার অনশন ধর্মঘট করেছিল। সে তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। তাদের তখন নিয়মিত স্কুলে ক্লাশ করতে যেতে হতো না। তাই স্কুলগামী ছাত্রদের সাথে হোষ্টেল সুপার ভাত খেতে বাধ্য করলে পাল্টা প্রতিবাদে ও পরীক্ষার্থী হিসেবে তাদের সুবিধামতো খাবার নিয়ম চালু করার দাবীতে এই অনশন ধর্মঘট ডেকেছিল। সফল হলে পরে তবে সে অন্ন গ্রহণ করেছিল। সেটাই ছিল তার জীবনে সংগ্রামের প্রথম সোপান।

চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে ভর্তি হয়ে যে হোস্টেলে সে উঠেছিল তার নাম 'পাহাড়ী ছাত্রাবাস বিন্দু নিলয়'। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে থাকার সময় সে একবার আমার কাছে এসেছিল খুব কম সময় নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল আইএ ফরম ফিলাপের টাকা সংগ্রহ করা। বাবা তাকে যে কোন কারণে টাকা যথাসময়ে পাঠাতে পারেননি। তখন আমি রাঙ্গামাটি ক্যাথলিক মিশনে শিক্ষকতা করতাম। রাতের মধ্যে টাকা সংগ্রহ করে তাকে চট্টগ্রাম ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএ পাস করলো। একই কলেজে বিএ পড়াকালীন সময়ে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

তখন চট্টগ্রাম জেলখানার এক বাঙালী দারোগার সহায়তায় কেবলমাত্র পরীক্ষা দেবার জন্য জেল থেকে জামিন লাভ করে। পরীক্ষা শেষ করে আবার তাকে কারাগারে যেতে হলো। পরীক্ষা দেবার সুযোগ না পেলে তার হয়তো বিএ পাস করা হতো না। সেই বাঙ্গালী দারোগা ছিলেন বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে দারোগা সাহেব মঞ্জুকে পুত্রস্নেহে দেখাশুনা করতেন।
উল্লেখ্য, বামপন্থী আইনজীবী জনাব লুৎফর হক মজুমদারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সে মামলা থেকে খালাস পায়। মুক্তি লাভের পর চট্টগ্রামস্থ বিপ্লবী বন্ধুরা তাকে জেএম সেন হলে সম্বর্ধনা দেন। সেই তরুণ বয়সে মঞ্জু যখন জেলে ঢুকল। তখন বাবার কাছে এব্যাপারে জানতে চাইলে, কোন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছাড়াই বাবা শুধু বলেছিলেন, জেলে যাওয়ার পথ যেহেতু সে জানতে পেরেছে, তাহলে বের হওয়ার পথও সে খুঁজে পাবে।

জন্মভূমি আর জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ

তখন বুঝতে পারিনি সেই তরুণ বয়সেও তার জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ কত গভীর! আর দেশপ্রেমটাই বা কী? কাপ্তাই বাঁধের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে দেখতে দেখতে বাঁধের পানি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে নিচ্ছে। আমাদের সুন্দর প্রিয় গ্রামটিও ডুবে যাবে। সবার মধ্যে এক ধরনের উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা আর শোক শোক ভাব। ধীরে ধীরে আমাদের বাড়ির দিকেও ধেয়ে আসছে পানি। ঠিক এমনি সময়ে মঞ্জু আমাদের বাড়ির দেয়াল থেকে এক খন্ড আর উঠোন থেকে আরেক খন্ড মাটি নিয়ে কাগজে ভালোভাবে মুড়িয়ে আমার হাতে তুলে দিল। আর আমাকে বলছিল এই জিনিসগুলি প্রাণের চেয়ে সযতনে রেখে দিতে। সেদিন সেটা হাতে তুলে নিতে নিতে আমি ভাবনার সাগরে ভাসছিলাম আর অবাক হচ্ছিলাম। আমার ছোট ভাই আমাকে কি কোন যাদুকরের অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণ করে দেয়ার ভার দিচ্ছে! কাগজের প্যাকেটটি খুলে মাটির খন্ডগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ভাবতে থাকি আর মনে মনে প্রশ্ন করি, এই মাটির খন্ডটিতে কী স্বার্থ বা কোন স্মৃতির সাক্ষী বহন করছে কি? তখন মঞ্জুকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এই মাটির টুকরো? তখন সে উত্তরে 'এই মাটি অমূল্য জিনিস' বলে আর কিছু না বলে কেবল একগাল হেসে চুপ করে থাকে। নানা ভেবে চিন্তে তার কথা রক্ষা করলাম মনেপ্রাণে, সযতনে তা রেখে দিলাম একটা ট্রাঙ্কে। তার সেদিনকার সেই মাটির খন্ডগুলোর প্রতি এমন মায়া-মমতা, শ্রদ্ধাবোধ বুঝতে পারিনি। আজ এই শেষ বয়সে এসে তা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি, সেই মাটি মানুষের কতটুকু প্রয়োজন! আজ বুঝতে পারছি মঞ্জু সেই সময়েও নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ও বাস্তুভিটাকে কত গভীরভাবে অনুভব করেছিল, ভালোবাসতে পেরেছিল!

সেই সময়ে জাতির ভবিষ্যত নিয়েও তার কত চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা! বাঁধের পানি আসার আগে যখন বন-বৃক্ষ কাটার কাজ চলছিল তখন প্রায়ই সে জাতির ভবিষ্যত নিয়ে হা-হুতাশ প্রকাশ করত। তখন চট্টগ্রামে আই পড়ার সময় মাঝে মাঝে বাড়ী এলে প্রায়ই জাতির ভবিষ্যত নিয়ে তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কথা জানাত। এসময় গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি ও মুরুব্বীদের সাথে আলাপে বসত; জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলত; জায়গা-জমি পানিতে ডুবে যাওয়ার পর কে কী করবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করত। আসলে সেই কৈশোর বা তরুণ বয়স থেকে তাকে কেমন অন্য ধাঁচের মনে হত। যাকে বলে ভিন্ন প্রকৃতির। নেতৃত্বের গুণাবলী ও প্রতিভা সেই স্বল্প বয়স থেকেই তার মধ্যে প্রতিভাত হচ্ছিল।

শেষ দেখা হয়নি

সারাটা জীবন কোলে-পিঠে করে তাকে মানুষ করেছি। তার সাথে আমার সর্বশেষ দেখা ১৯৭৬ সালে, সম্ভবতঃ মে/জুন মাসে। তখন তাঁর বনবাস (আত্মগোপন) দু'বছরে পদার্পণ করেছে। শেষ জীবনে কিন্তু মন ভরে তাকে দেখতে পাইনি। এমনকি তার মরদেহটাও পর্যন্ত দেখতে পাইনি। সেটাই আমার বড় দুঃখ হয়। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বিভেদপন্থী বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করার খবরটাও শুনতে পাই অনেক দেরীতে। ◆

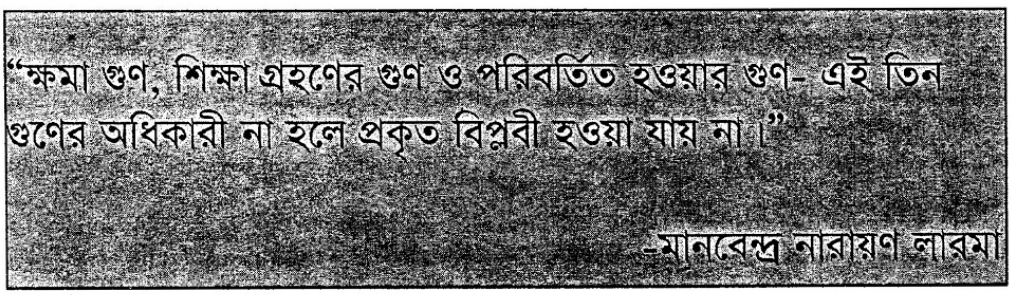

A Glowing Tribute To A Leader

Mong Sa Nu

This planet has seen hundreds of indigenous peoples who disappeared from the face of the earth in their arduous journey through history in the face of aggression from the more organized or stronger and numerically larger races. The latter came in hordes from near and far lands to plunder complex-free and easy going indigenous folks who held in collective ownership valuable resources in the form of land, minerals, forests, waters etc. Of these indigenous peoples, some succumbed to the onslaught without offering any resistance to the invading marauders, some few mounted a nominal resistance and put up an unequal fight and perished in the process. But still there are some few who were defiant and fought a bloody battle to be disintegrated as a race. Some melted away with the invaders. This is a painful legacy that the indigenous peoples have come to inherit for thousands of years. To get extinct has become a destiny for them. These ruthless and brutal stories of racial elimination in the annals of history flashed through my mind for a moment as I pondered to pen through a few lines in respectful memoriam of Manabendra Narayan Larma (M N Larma), who stood exceptional as a leader of the Jumma people in many ways. For the first time in the history of Chittagong Hill Tracts (CHT hereafter) a voice of defiance raised by this otherwise calm and composed man against injustice resonated throughout the region. He will go down in the History of CHT as the first ever political activist who was prepared to go to any length to realize the legitimate rights of the indigenous people. The demand was not for new rights but continuation of what they enjoyed during Pakistan period.

It was in the year 1964 when I first met him while he was kept in captivity in the Chittagong Jail. He was arrested for some articles that recounted the tales of woes and sufferings that the indigenous peoples of CHT had to bear with following the damming of Karnafully River. About one lakh people belonging to different ethnic communities lost their ancestral homesteads and best farmlands under the rising waters of the river causing colossal damage to the indigenous economy and their social structure which was never quantified following poor level of political consciousness among the hill people. In those days hill people did not enjoy access to political activities. Government in those days used to consider political dissidence or criticism of any government activity/policy in the CHT as anti-state and therefore a criminal offence. Politics was a forbidden fruit for the hill people who were wrongfully discredited to be wanting in loyalty to the state of Pakistan. There were no organizations of any kind which might have worked as the mouthpiece of the suffering people. An atmosphere of suffocation was pervasive all around. Visibly agitated and moved at the untold miseries of the people displaced by the Kaptai Dam and the unfair deal with respect to adequate compensation and proper rehabilitation perpetrated on hill men by the then government, M.N. Larma decided to speak out the hearts of the people so long kept shut. It was an outstanding courage on his part to do that as members of the indigenous communities in those periods could hardly think of speaking against the government on its wrongful activities and policies. Government was not also prepared either to yield to a stubbornly unyielding young man from the hill communities speaking out his heart. The first ever protest in writing, as it was, in the form of leaflets against the human catastrophe caused by the Kaptai Hydro-Electric Project took the government by surprise. Soon he was detained.

I don't remember the day and the date on which I met him as the age is having its toll on the faculty of my memory. But the meeting is still vivid in my memory, as fresh as a budding leaf. I was then a first year student in the Chittagong College doing my honors course in economics. Of course in the year following I got myself transferred to Dacca University. I remember that I accompanied Shantuda (Jyotirindra Bodhipriya Larma, the honorable Chairman, Chittagong Hill Tracts Regional Council) to the Chittagong Court Building where M.N Larma was to be produced on that day for the resumption of hearing of his case. We waited near the court hajat. Soon M.N. Larma was brought out of the court hajat and taken to a nearby room used by the police. He was in all white, a white trouser and a white shirt. He was smiling. He looked at me inquiringly and asked Shantuda about my identity. He seemed to have been extremely pleased and felt encouraged at my coming to see a political prisoner who was arrested on charge of anti-state activity. Hill men in general in those days were very much afraid of getting involved in politics. As Manabendra Narayan Larma was detained on political ground nobody, even his close friends, dared meet him in the jail or in the court as the

police might suspect them as having any link with his political thought. That is why my presence in the court surprised him and from then onwards he took a fascination for me that lasted till his last days.

It was a sheer excitement for me to see a man who had shown the courage to dismantle the age old taboo of giving acquiescence to any actions, good or bad, taken by the government for implementation in the CHT. He was the pioneer in Pakistan period to show the path to speak out against injustice. It was a wonderful experience to meeting a man whom I started adoring as soon as I learned about his intrepid stand he took in defense of his jumma people. Now the man was in front of me. I was amazed at the resoluteness and firmness of purpose in his face. His eyes were shining with resolve and conviction for what he was aiming to do. He enquired about the wellbeing of his parents and other family members from Shantuda, his younger brother, also a resolute man known for his tenacity. He also wanted to know from Shantuda about the latest developments in CHT, activities among the indigenous students' circle, their level of consciousness, their readiness to work for the tyrannized and maltreated Jummas. Lastly he asked for the details of progress of his case. The problem was with the government. Police failed to prove that M.N. Larma was involved in anti-state activities and was consequently buying time by shifting the time of hearing of his case time and again.

He was much worried at the state of affairs that the indigenous communities in the CHT were made to put up with. Which concerned him most was that the Jummas neither had political authority nor they had economic power. People without economic and political power according to him could hardly survive in the face of stiff economic and social agression coming from the powerful neighboring communities unless special constitutional provisions were made to protect the weaker. He used to say that the jummas were much exposed to the threat of gradual elimination in an independent Bangladesh than they were in Pakistan where they enjoyed constitutional protection both in the constitutions of 1956 and 1962. I can still remember him talking to me at the MNA hostel in Dacca way back in 1973 during the Constitutional Assembly session: "I come to learn from a reliable source that the draft constitution to be placed for approval in the Constituent Assembly does not contain any provision safeguarding the interests of the indigenous peoples of CHT. All people belonging to different caste, creed, ethnicity living in the geographical boundary of Bangladesh will henceforth be known as Bangali. Sheikh Mujibur Rahman has wiped out the identity of indigenous peoples with the stroke of a pen. My last hope has been shattered. Something has to be done and we have to be prepared for the worse. I do not know where this body of mine will lie dead." He was sounding prophetic. At least I thought that way on that day. Amazingly he was proved true in later years.

Few days after, the draft constitution was tabled before the Constituent Assembly. Excepting M.N. Larma all other members of the Constituent Assembly belonged to Awami League. They were all praise for the Bangabandhu, the founder father of the nation, for presenting the nation with a constitution fully democratic and secular within a span of nine months. They were not interested to care for the apprehensions of the ethnic peoples, a greater proportion of which lived in the CHT. The personality of Bangabandhu was so great and overshadowing that no members of the Constituent Assembly dared speak against his wishes. M.N. Larma taking the floor of the Assembly declared in presence of Sheikh Mujibur Rahman that he did not endorse a constitution which did not contain provisions safeguarding the interests of not only the indigenous peoples of Bangladesh but also the interests of the downtrodden and underprivileged farmers and workers working in the field and factories, fishermen fishing in the rivers of Bangladesh and other disadvantaged and marginalized people spreading all over the country. This was indicative of his wish that a country's constitution should aim at building an egalitarian society where all people high or low, whatever may be their creed or culture must be provided with an adequate space to breathe in their own way in their own environment. That he was bold not only in words but also in action was evident from his refusal to put his signature in the constitution in endorsement.

The ego of Bangabandhu apparently got wounded at this. It was beyond his imagination that someone in Bangladesh, at least in those days of 1973 when his words were considered divine, could dare go against his wish. He warned in his speech in the Assembly not to play with fire in an oblique reference to M.N. Larma's role. He warned of the severe consequences in the event of not complying with his admonition. M.N. Larma defied Sheikh Mujibur Rahman and his remonstration not to show his personal gallantry but to hold the indigenous causes high in the eyes of the nation. This particular role of M.N. Larma is a testimony of the extent of his commitment and dedication to the cause of his Jumma people. One can also easily conjure up of the extent of his involvement in the Jumma's movement for sheer survival which aimed at achieving vital protective measures for them in the form of constitutional safeguards.

M.N. Larma was a lone crusader against the unjust government policies which went against the general interest of the indigenous communities during the sixties. The local elite did not cooperate with him rather they were found eager to show their loyalty to the government. It was unfortunate in those days that anti-government stand was equated with anti-state activity. Common people used to believe that way. Local elite was no exception. Due to low level of awareness among the general mass it was difficult to drive home the idea that it was their democratic right to articulate their opinion with regard to the government policies that concern their life and living. Fortunately enough M.N. Larma, by and large, got the full backing of the student community studying at different colleges and universities of the country. Later they were to become his vanguard in his campaign for realizing the indigenous rights which they lost to the Bangladesh constitution. His popularity grew in stature among the greater section of students and people in general in the greater Chittagong Hill Tracts. Gradually he became a role model for many of them. It was a great achievement for him.

No other leader in the CHT is so much respected and honored as Manabendra Narayan Larma. No name was as frequently uttered as his name. Human beings are not angels. M.N. Larma was not above blemish either. But whatever infirmities he had was outshined by the contributions he made to the development in the level of political thinking in the CHT. His stubborn resistance to the unjust machination of the coterie in power constrained the government to find out a lasting solution to the ethnic problems in the hills. The present scenario in the hills is nowhere near the arrangement he sought and fought for. I do not know what his lieutenants whom he guided and led, who share his visions, dreams and ideals are as committed and dedicated as M.N. Larma was, to fight their way up to the destination that M.N. Larma set for. I hope that they have not lost their way. His visions will come true only on the meticulous continuance of his style of leadership.

Used to a very simple life-style he was soft spoken and introvert in nature. A pair of khaki trousers and a pair of white cotton shirts, very cheap in price, were his dress. He had a strong distaste for perfumes or cosmetics. When he was MP, poor folks from the villages used to come to him with the hope of getting their problems solved. They come with pack of vegetables, as they were unable to afford costly items, to be presented to him as a complementary gift or tribute. He never agreed to keep them unless they accept the reasonable price he offered them. He could have easily resigned to the cozy comforts of urban living. Avenues were open to him. But he preferred to go underground and opted for a fugitive life to place himself and his services at the altar of Jumma cause. How many people can resist the temptation of an assured life?

In the beginning of this article I happen to touch upon the painful saga that the indigenous peoples all around the world have been experiencing throughout the human history. Many fell prey to the stronger or larger human predators. The number of indigenous peoples in the world is now alarmingly being adjusted down the numerical scale. In other words, elimination process being active as ever, the indigenous peoples are decreasing in numbers at an alarming rate. Indigenous peoples in the CHT lived and multiplied here for centuries with an order of living and a culture of their own shaped out by the hills and forests around them, are struggling hard to survive. Their breathing space has narrowed considerably. Are these miserable indigenous communities capable to stop them from being caught up in the historical elimination process? Their Messiah M.N. Larma who tried to lead them out of this critical situation and in whom they reposed their hope for survival is no more. Can it then be inferred that the CHT indigenous peoples are no exception to their historic predecessors and have just joined the historical caravans heading for their inevitable 'tryst with destiny'? This question keeps on hammering my mind as I remember great M.N. Larma on his death anniversary. ♦

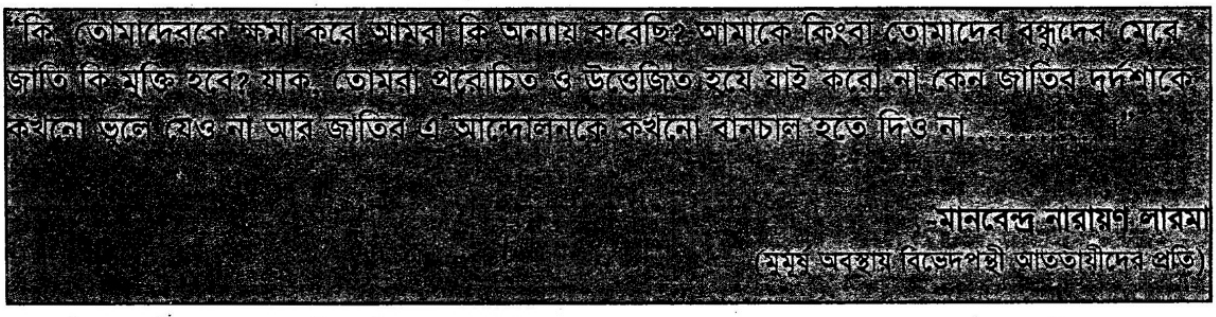

শংখ নদী তীরে যেন জীবনের গান শুনতে পাই?

সঞ্জীব দ্রং

১. বান্দরবান গিয়েছিলাম। এই শহরে বহুবার এসেছি আমি। যতবার শহরে ঢুকেছি মন খুব খারাপ হয়েছে শহরের মধ্যে পাহাড়ি মানুষ না দেখে। উজানীপাড়া আর মধ্যমপাড়ায় কিছু পাহাড়ি মানুষ দেখা যায়। বাকী শহর জুড়ে বাইরে থেকে আসা বাঙালিদের বসবাস, দোকানপাট, চলাচল, আনাগোনা, হৈচৈ, সব। বুঝতে পারি বান্দরবান শহর থেকে ভবিষ্যতে পাহাড়ি মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন। আর আমাদের তা মেনে নিতে হবে মন খারাপ হলেও?

পাহাড়ের বন্ধুরা ঠিক করেছিলেন আমরা যেন শহরে থাকি। আমরা শহরে থাকতে চাইনি। তাই রাতেই চলে গিয়েছিলাম চিম্বুকের পথে মিলনছড়ি। পাহাড়ের মধ্যে চমৎকার থাকার জায়গা, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদি। বাঁশের ঘরের থাকার ঘর, সামনে দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়, শংখ নদী বয়ে যায়। আরও চমৎকার জোছনা রাত। না ঘুমিয়ে গভীর রাত আমরা পার করে দিই। ভাবি, এই পাহাড়-বন-নদী-জুমক্ষেত-বয়ে চলা পথ-বাগানবাগিচা-শৈলপ্রপাত সব পাহাড়ি মানুষের অধিকারে দিলে কত ভালো হতো? প্রকৃতির প্রতি, সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও নির্লোভ সংস্কৃতি থেকে এরাই এদের যত্ন ও রক্ষা করতে পারতো? কিন্তু তা কি হয়? পাহাড়ি মানুষের চিন্তা তো রাষ্ট্র বুঝতে পারে না।

বান্দরবান গিয়েছিলাম নবীন ও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুষ্ঠানে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করলেও বরণ করে নেয়া হয়েছে পাহাড়ি-বাঙালি সকল ছাত্র-ছাত্র ছাত্রীকে। বক্তৃতা পর্বের শেষে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অনেক বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীকে দেখেছি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সন্তু লারমার কাছ থেকে পুরষ্কার নিতে। আমি দেখলাম, অনেক মুসলমান বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী পুরষ্কার নিতে এসে সন্তু লারমাকে 'নমষ্কার' বলে সম্মান দেখাচ্ছেন। আমি আমার পাশে বসা পাহাড়ি নেতা কে এস মংকে বললাম, ওরা তো 'স্লামালেকুম' না বলে নমষ্কার বলছেন। মংদা বললেন, হ্যাঁ ওরা অনেকে বলে এবং এটি জানে। আমার কাছে 'নমষ্কার' বা 'স্লামালেকুম' বিষয়টি বড় নয়, কিন্তু এ তরুণ কলেজ পড়া বাঙালি মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের এ দিকটি ভালো লেগেছে আমার। ভালো লেগেছে এ জন্য যে, ওরা অন্তত পাহাড়িদের বলার সংস্কৃতি বুঝতে চেষ্টা করছেন এবং নিজেরা ব্যবহার করছেন। অথবা ওরা হয়তো উপলব্ধি করেছেন, পাহাড়ি এই নেতাকে নমষ্কার বলে সম্মান দেখানোই উচিত। অন্যের সংস্কৃতি বা অন্যের ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা করবার, মেনে নেবার এই যে সংস্কৃতি, এটির খুব অভাব আমাদের দেশে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তো বটেই।

ঢাকা থেকে সিপিবির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান ও নাট্যকার মামুনুর রশীদ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এর আগে বহুবার বান্দরবান গেলেও বক্তৃতা করতে যাওয়া আমার এই প্রথম। তার আগে আমি যখন খবরের কাগজে 'আদিবাসী মেয়ে' কলাম লিখতাম, তখন রোয়াংছড়ি, নোওয়াপ্তং, চেমি মুক, ডলুপাড়া, চিম্বুক, মেননিয়াং পাড়া, সুয়ালক, এম্পুপাড়া, বমদের ফারুক পাড়া - এসব জায়গায় গিয়েছি। তবে এবারই প্রথম বান্দরবানের কোনো অনুষ্ঠানে অতিথি বা আলোচক হয়ে গেলাম। আমি অবাক হলাম এবং অনুপ্রাণিতও বোধ করলাম, এখানের পাহাড়ি শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আমার এই 'দেশহীন মানুষের কথা' কলামটি মনযোগ দিয়ে পড়েন। আমি কেমন লিখি, সেটি হয়তো পাঠকেরা বলবেন, কিন্তু এটি তো সত্য যে, পাহাড়ি মানুষের দুঃখ-কষ্ট-স্বপ্ন-সংগ্রামের কথা খুব বেশি তো লেখা হয়নি। তাই অনুষ্ঠানের শেষে ও মাঝামাঝি সময়ে পাহাড়ি অনেক ছেলেমেকে আমার অটোগ্রাফ দিতে হলো। এ কাজটি আমি করতে পারি না, বিব্রতবোধ করি। ১৯৯৮ সালে রাঙ্গামাটিতে যখন প্রথম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমাকে অটোগ্রাফ দিতে হয়েছিল। তখন সঙ্গে ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। কবি শামসুর রাহমান কাগজে অটোগ্রাফ লিখতেন, সুখী হও, কল্যাণ কামনায়...। আবার লিখতেন, ভালো থে কো ..এরকম। আমি ভাবলাম, এতো কম কথায় লেখার যোগ্যতা আমার হয়নি। তাই সময় নিয়ে আমি বান্দরবানে ছেলেমেয়েদের কাগজে লিখেছি, যত দূরে যাও, এই শংখ নদী, শৈলপ্রপাত, পাহাড়-বন-জুম ক্ষেত, চিম্বুক, কেওক্রাডাং, বাঁশের মাচাং ঘর আর মানুষদের ভালোবাসো, মনে রেখো। ভালো ছাত্র-ছাত্রী হও, উচ্চশিক্ষিত হও, শহরে যাও, তবুও একেবারে দূরে থেকো না কোনদিন। মন ফেলে রেখো এই পাহাড়ের বুকে। এই ঢেউ খেলানো পাহাড়-বন-নদী তীরের মানুষেরা তোমার জন্য অপেক্ষায় আছে। ওদের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা দূর করতে হবে। পাহাড়ি জননীর অশ্রু মোছাতে হবে। অশুচি হয়ে গেছে অরণ্য জননী, একে সুন্দর করতে হবে। কয়েকটি মেয়েকে লিখেছি, ওই পাহাড় বনভূমিকে ভালোবাসতে পারলেই তুমি যাবে বহুদূর, চেষ্টা করো। এরকম উদ্দীপনামূলক কথা লিখবার চেষ্টা করেছি তরুণদের খাতায়। আমি বিশ্বাস করি, ওরাই একদিন আদিবাসী সমাজকে অনেকদূর নিয়ে যাবে। বক্তৃতায় বলেছিলাম, পথ চলা শুরু করো, দেখবে গন্তব্যে একদিন পৌছতে পারবেই। না পারলেও ক্ষতি নেই, কারণ গন্তব্যে পৌছার চেয়ে যাত্রাপথ অনেক সুন্দর। এরকম কথা বলেছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। এই তরুণ কলেজপড়া পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা কি আমার কথা মনে রাখবে? ওরা কি উচ্চ শিক্ষিত হবে সমাজ থেকে বহুদূরে চলে যাবার জন্য, হারিয়ে যাবার জন্য? নাকি সমাজের শিকড়ে মুক্তির সন্ধান করবার জন্য?

পরদিন সকাল বেলা চিম্বুকের উদ্দেশ্যে রওনা হই। শৈলপ্রপাতের পর দু'ধারে পাহাড় আর পাহাড়। দূরে রোয়াংছড়ি, থানছির পথ। আরও দূরে রুমা, তাজিংদং, কেওক্রাডাং? পাহাড়ি মানুষের ছোট ছোট গ্রাম, জুমক্ষেত, বসতঘর। ভূমির পর ভূমি। এখন আকাশের

মেঘ অনেক নীচে, পাহাড়ের গায়ে যেন মিশে আছে। ওদিকে ম্রোদের পাড়া। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা রাস্তায় গেঞ্জি পরে কাজ করে। পথ চলে রুমা-থানছি। এই পাহাড়-আকাশ-মাটি-অরণ্য-নদী-মেঘ-গ্রামের পর গ্রাম-জুমক্ষেত-ফেলে রাখা জমি, বাগানবাগিচা - সব তো পাহাড়ি মানুষের ছিল। ওরা কি কোনদিন এসব আর ফিরে পাবে? ফারুকপাড়ায় এসে বমদের একটি সভায় যোগ দিলাম। ওরা বললেন, এই গ্রাম, জমি, বাগিচার জায়গা সব আমাদের। এখনও আমাদেরই দখলে, বংশপরম্পরায় আমরাই এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্র কি পাহাড়িদের এ ভূমি মালিকানার সংস্কৃতি মানে বা জানে? তবু ওদের কথা শোনে ভালো লাগলো। বুঝতে পারি ওরা জেগে উঠছেন। শংখ নদী তীরে যেন জীবনের গান শুনতে পাই।

২. আজ পাহাড়ের স্বপ্নদ্রষ্টা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার মৃত্যুবার্ষিকী। ফিরে ফিরে আসতে আসতে এত বছর হয়ে গেল। একটি 'জুম দেশে'র স্বপ্ন দেখতেন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, মহাপুরম গ্রামের এক পাহাড়ি পরিবারের এক অসাধারণ যুবক। আমি এখনও বিশ্বাস করি, তাঁর মতো করে সাধারণ জুমিয়া মানুষের জন্য তেমন করে কেউ ভাবেননি, ভাবতে পারেননি। জুমিয়া কৃষকের দুঃখ তাঁর মতো করে কাউকে স্পর্শ করেনি। চিরবঞ্চিত জুম্ম জনগণের ওপরে শাসকশ্রেণীর বিরামহীন শোষণ তাঁকে যেন বিচলিত করে তুলেছিল। কী চেয়েছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা? খুব বড় অসম্ভব কোনো স্বপ্ন তো ছিল না তাঁর মধ্যে। বাংলাদেশের বিশাল সংবিধান নামক খাতায় কিছু শব্দ যোগ করতে চেয়েছিলেন নিজের জাতিসত্তার সম্পর্কে? সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকার কথা বলা কি খুব বেশি চাওয়া ছিল? একটি গণতান্ত্রিক দেশের এ কেমন সংবিধান যেখানে তার নাগরিক ৪৫টি জাতিসত্তা সম্পর্কে একটি শব্দ বা একটি লাইনও লেখা নেই? এই সংবিধান নিয়ে খুব বেশি কি গর্ব করতে পারি আমরা? তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণহীন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, যেখানে পাহাড়ি মানুষেরাও মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে, দিঘীনালার পথে কোনো পাহাড়ি যুবতী আর লাঞ্ছিত হবে না, সেটেলাররা দলে দলে লোগাং, কাউখালি, মাটিরাঙ্গা, লংগদু, নানিয়ারচর, গুইমারা পাহাড়-বনভূমি দখল করে নেবে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল থানা সদর ও জেলা সদরে শুধু বাঙালি মানুষের মুখ দেখা যাবে না, পাহাড়ের বাজার-দোকানপাটে শুধু সেটেলার দেখা যাবে না, জুম ক্ষেতের মাচাং ঘর থেকে পাহাড়ি যুবতীকে কেউ অপমান করতে পারবে না, জুম ক্ষেতে ফসল হবে, পেপে-মারফা-ধান-লেবু-সবজি আরও কত কী? সে সব দ্রব্যের ঠিক মূল্য পাবে জুমিয়া কৃষক, সুখ থাকবে পাহাড়ি মানুষের জীবনে, আর অন্যরা তাদের সম্মান করতে শিখবে, পাহাড়ের শিশুরা মনের আনন্দেই স্কুলে যাবে, স্কুলে আজগুবি নয় পাহাড়ের গল্প বলা হবে, স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করতে পারবে পাহাড়ের সন্তানেরা - এই-ই তো চেয়েছিলেন পাহাড়ের এই বিশাল মানুষটি। গেংগুলিরা হয়তো আবার ফিরে আসবে গ্রামে তাদের পালাগান নিয়ে, রচিত হবে নতুন ইতিহাসের গান, কাপ্তাই বাঁধের কারণে জুম্ম জনগণের দুঃখের দীর্ঘ পালাগান, প্রতিবাদের সংগ্রামী কত গান? রাঙ্গামাটির বনরূপার নাম ভুলে যাওয়া তরুণীরা আমাকে বলেছিলেন দুঃখ করে, রাঙ্গামাটি দিন দিন অসুন্দর অশুচি হয়ে যাচ্ছে, অচেনা মানুষে ভরে যাচ্ছে পাহাড় দেশ, আর ভালো লাগে না?

এখন আমাদের কাজ করে যেতে হবে আদিবাসী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, শোষিত সব মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে। আবার রাঙ্গামাটির হ্রদের জলের অধিকার, হাজার হাজার একর জমি, ধানি জমি, পাহাড়ি গ্রাম কি কোনদিন ফিরে পাবো আমরা? যতবার আমি রাঙামাটি যাই, হ্রদের জলে নামি, তাকিয়ে দেখি লুসাই পাহাড়ের দিকে, পাহাড়ি গ্রামের দিকে যাই, আমার খুব কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার আত্মা যেন কাঁদে, তাঁর ক্রন্দনধ্বনি যেন আমরা শুনতে পাই, যেন পাহাড়ের বুক থেকে কথা বলেন তিনি, তাঁর আত্মা কষ্ট পায়, আমাদেরকে যেন বলেন 'সব ফিরে পেতে হবে আবার', আগের মতো। এই বিস্তীর্ণ হ্রদের জল ও জমি, বিশাল পাহাড়, ফুরামন পাহাড়, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা. তঞ্চঙ্গ্যা গ্রাম, ম্রো-বমদের জুম ক্ষেত, পায়ে হাঁটা পথ, মাইনি-লোগাং-শংখ-চেংগি নদীর দুই কূল - সব ফিরে পেতে হবে।

অনেক আশা নিয়ে একটি চুক্তি করেছিলেন পাহাড়ের মানুষেরা। সেও প্রায় নয় বছর হয়ে গেল। ১৯৯৭ সালে পত্রিকায় আশাভরা যে মুখগুলো দেখেছিলাম শান্তিবাহিনীর সদস্যদের, নতুন স্বপ্নে ছলছল করা সেই মানুষগুলো আজ কেমন আছেন? চুক্তির মূল কথাই তো বাস্তবায়িত হয়নি, যাতে বলা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে কিছুদিনের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে যাবে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল। আমরা কি অসহায়ের মতো দু'চোখ ভরা জল নিয়ে এ অবস্থা মেনে নেব? আজ পাহাড়ে যে তরুণ ছেলে লংগদুর অরণ্যে জুমে কাজ করে, তারও তো ঘরসংসার হবে, মাচাংঘরের কোল আলো করে পাহাড়ি শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, তার বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে - তা কি মেনে নিতে হবে? যেটুকু পাহাড় আছে আমাদের, তাকে তো পরম মমতায় রক্ষা করতে হবে ওই নতুন শিশুর জন্য?

এ জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তা হলেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন পূরণ হবে। আজ থেকে পাহাড়ি জননী তাঁর সন্তানদের মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার গল্প, তার সংগ্রামের গল্প বলুক। সংগ্রামের গল্প শুনতে শুনতে, পরের জন্য, আদিবাসী জাতির কল্যাণের জন্য আত্ম-ত্যাগের কাহিনী শুনতে শুনতে যেন পাহাড়ের সন্তানেরা বড় হয়। শংখ-চেংগী-মাইনী নদীর গল্প। পাহাড়-নদী-বন-মগবান-তুলাবান-আমতলী-সুরাখালী-দোসর পাহাড় ও লংগদুর গল্প। পাহাড়ি মানুষের মুক্তির গল্প, সংগ্রামের শেষে বিজয়ের গল্প?♦

কিছু স্মৃতি

প্রিয়দর্শী খীসা

১৯৬৬ ইংরেজী। দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়, মহকুমা রামগড়, তদানীন্তন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা। শ্রী নীলধ্বজ চাকমা (অবঃ শিক্ষা কর্মকর্তা) ছিলেন প্রধান শিক্ষক, প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (মঞ্জু) ছিলেন সহকারী শিক্ষক এবং আমি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক। আমরা তিনজনে ছাত্রাবাসের পূর্বপ্রান্তে একটা বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা একটা কামরায় তিনটি চৌকি বসিয়ে থাকতাম। আমাদের খাবারের রান্না স্কুলের দপ্তরী রমানাথ বড়ুয়া প্রধান শিক্ষকের কোয়ার্টারেই করতো এবং আমরা সেখানেই আমাদের খাওয়া সারতাম। এই যে অবতারণা, তার একমাত্র কারণ হলো, প্রয়াত শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবনের বাইরে যে একটা অন্য ব্যক্তিসত্তার মননযুক্ত মানসিকতা ছিল তারই একটা আভাসমাত্র।

একজন রাজনৈতিক কর্মী বলতে সচরাচর আমরা রসকষহীন যুক্তিনির্ভর চিন্তার দ্বারা চালিত হবার স্বাভাবসুলভ একজন ব্যক্তিত্বকে পরিচিহ্নিত করে থাকি। তাঁর হৃদয় সম্পর্কেও আমাদের ধারণা হয়তো বা কঠোর শৃংখলাবদ্ধ নির্ধারিত রুটিন মাফিক পরিচালিত হৃদয় বৃত্তির নামধেয় কিছু একটা বিবেচনা করি। একবার আন্তরিকভাবে গৃহীত আদর্শকে (নিজের তাত্ত্বিক জ্ঞানালোকে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে) দৃঢ়চিত্তে পোষণ করা এবং সযতনে তা লালন করাই হল তাঁর একমাত্র ব্রত বলে আমরা জানি। ঐ নীতিবোধের আলোকে সমাজের অবক্ষয় রোধ করা, সামাজিক, জাতীয় যাবতীয় কদর্যতাকে পরিমার্জন পূর্বক সুশীল এবং আদর্শ সমাজব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষে আদর্শের নীতিমালা প্রণয়ন ও সুষ্ঠু প্রয়োগ করা এবং সমাজে তার সফল বাস্তবায়নের বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্যে সার্থকতা খুঁজে পাবার একজন স্বপ্নদ্রষ্টা আর সর্বোপরি স্বপ্নের সার্থক বাস্তবায়নের একজন সত্যিকার একনিষ্ঠ স্রষ্টা হিসাবে আমরা মনে করি।

কিন্তু তারও পরে শ্রী লারমা যে একজন স্নায়ু, অস্থি-মজ্জার কাঠামোপরি চর্ম দ্বারা পরিবৃত্ত বহিরাবরণের মধ্যবর্তী রক্তমাংসে গঠিত মানুষ নামধেয় একজন অতি সুকুমার প্রবৃত্তির বিবেক সম্পন্ন সুপুরুষ ছিলেন, তাও কিন্তু কোনক্রমেই মিথ্যা নহে এবং সে কারণেই সম্ভবতঃ শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একজন অতি উচ্চমানের রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে যে একটা নির্মল অতি প্রশান্ত অন্তকরণের অস্তিত্ব ছিল এবং তদ্বারা তিনি একটা অকৃত্রিম ক্ষান্তি, মৈত্রী ও মুদিতার নিশ্চিদ্র আবেষ্টনী তৈরী করতে পারতেন, তারই অন্তর্গূঢ় কিছু ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরবার মানর্স থেকে এ প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা।

১৯৬৬ ইংরেজী, সে সুদীর্ঘ অতীতের ছিন্নপত্রসম জীবনের একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়। তাই কোনটারই দিন তারিখ উল্লেখ করতে পারলাম না। যতদূর মনে হয় শেষ বর্ষা হবে। নিত্যদিনের মতন সেদিনও যথারীতি যথাসময়ে স্কুল ছুটি হলে আমাদের আবাসস্থলে ফিরে আসি। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা তিনজনে সবসময় সবকাজে একই সাথে থাকতাম। যেমন, স্কুলে যাচ্ছি একজনের পিছনে অন্যজন হিসাবে এবং স্কুল ছুটির পরেও বাসায় ফেরার সময় ঐ একইভাবে ফিরতাম। সেদিনও বাসায় ফিরে কাপড় পাল্টিয়েছি, হঠাৎ কী যেন মাথায় খেয়াল চাপতে আমি এবং নীলধ্বজ বাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, (উল্লেখ্য যে, আমরা দুই জনেই নীলধ্বজ বাবুকে মামা সম্বোধন করতাম) চল, বোয়ালখালী বাজার থেকে ঘুরে আসি।' মনের মত যদি কিছু পাওয়া যায় তজ্জন্য দপ্তরী রমানাথকেও সাথে নিলাম। দীঘিনালা স্কুল থেকে বোয়ালখালী বাজারের দুরত্ব আড়াই কিলোমিটার হতে পারে।

শেষ বর্ষার সময়। কাঁচা রাস্তা। কাদায় কাদায় সয়লাব। বিশেষ করে বাজারের সন্নিকটে অর্থাৎ কাট্টল্যা মুড়া থেকে নামার পর ধানিজমির মাঝখান দিয়ে যে অংশটা তা পাঁকে পাঁকে একেবারে টইটুম্বুর। মনে হয় যেন ধানের চারা রোপনের জন্য জমি তৈরী করা হয়েছে, শুধু মই দিয়ে সমান করা বাকী আছে মাত্র অবস্থা। বাজারে পৌঁছে দেখা গেল বাজারের অবস্থাও তথৈবচ। গোটা বাজারে অনেকগুলি বটগাছ, আম-কাঠালের গাছ ছিল। ঐসব গাছের পাতা পঁচে এবং কাদায় ধানি জমির মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল, বাজারের অবস্থাও তার চাইতে কোন অংশে কম নয়। হাটু সমান কাদা বলা যায়। ঐ কাদাপূর্ণ বাজারে ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম কোণার দিকে একটা চায়ের দোকানের পাশে কয়েকজন ত্রিপুরা বিক্রেতা মাছ বিক্রি করছিল। সেখান থেকে মাগুর মাছ আর সোল মাছ মিলিয়ে আমরা মোট ৫ সের মাছ ২ টাকা দরে কিনে নিলাম। (তখন সেরের ওজনে মাপা হতো) মাছ কেনার আমরা আর দেরি করলাম না। শ্রী লারমা বললেন, চলো যাই নইলে মাছগুলি সব মরে যেতে পারে। অন্য কোন কাজও আর না থাকাতে অগত্যা আর দেরি না কওে বাজার থেকে বাসায় এসে রমানাথকে বলে দিলেন, আজকে রাত্রে খাবার জন্য কয়েকটা রেখে দিয়ে বাকিগুলো সব গজিটাতে (মাটির পাত্র) পানি দিয়ে ছেড়ে দাও। পানির মাছ বলে কথা, গজিটাতে মাছগুলো পানি পেয়ে নড়তে লাগলো আর সম্ভবতঃ সোল্লাসে মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে লাফাতে লাগলো।

সেদিনও আমরা যথাসময়ে রাত্রের খানা খেয়ে এসে তিনজনে যে যার চৌকিতে প্রাত্যহিক রীতিমতন বসে স্কুল সম্পর্কিত নানাদিক আলোচনা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে মাছগুলোও মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ তুলে নড়ছিল। আর একবার ওরকম শব্দ হলে লারমা বাবুও তাঁর দুই ব্যাটারী টর্চটা হাতে নিয়ে মাছের গজিটার কাছে গিয়ে মাছগুলো দেখে আসতে লাগলেন। এমনিভাবে আমাদের আলোচনাও চলছিল, মাছগুলোও মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে নড়াচড়া করতে লাগল। লারমাবাবুও প্রত্যেক ছলাৎ শব্দে

গজিটার পাশে গিয়ে মাছগুলো দেখে আসতে লাগলেন। এভাবে ৭/৮ বার যাওয়া-আসা করার পর আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখতো মাছগুলো কী অসহায়ভাবে দেখছে। তাদের চাউনিও কত করুণ।' এভাবে ২/৩ বার বলার পরেও আমরা তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলাম। অবশেষে তিনি তেজপূর্ণ স্বরে বলেই দিলেন যে, 'এই মাছগুলো তোমাদেরকে আর খেতে দেব না, কাল ভোরে মাইনীতে ছেড়ে দেবো।' তাতেও আমরা দু'জনেই কোন উচ্চবাচ্য বা কোন অভিমত করা থেকে নিবৃত রইলাম। অবশেষে রাত ১০ টার দিকে নিয়ম মাফিক আমরা আলোচনা বন্ধ করে ঘুমাতে গেলাম। পরের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে দেখি যে, শ্রী লারমাবাবু বিছনায় নেই। আমি কিন্তু গতরাত্রে ঘুমাতে যাবার আগে তাঁর স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ছাড়তে গেছেন। আমি উঠে বিছানাটা ঠিকমত গুছাতে লেগে গেলাম। শ্রী নীলধ্বজবাবু ঘুম থেকে জাগলেও বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এরই মধ্যে দেখা গেল শ্রী লারমাবাবু হাসি হাসি মুখে খালি গজিটা হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকছেন। অর্থটা হলো আমরা ঘুম থেকে জাগার আগেই তিনি মাছের গজিটা স্বহস্তে বহন করে নিয়ে গিয়ে সব মাছ মাইনীতে ছেড়ে দিয়ে খালি গজিটা হাতে নিয়ে ফিরে এসেছেন। দাঁড়িয়ে থেকেই আমাদেরকে বলছেন, 'দেখো মাছগুলো মাইনীতে ছেড়ে দিয়ে আসলাম। বড় পানিতে ছাড়া পেয়ে মাছগুলো কী আনন্দে পানির ভিতরে চলে গেল।' আমরাও কিছু বললাম না, বরং 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' এর আবহ তৈরী হয় মতন নীরবে তাঁর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলাম। যেহেতু মায়া মমতার ব্যাপার। প্রাণের প্রতি প্রাণের মমত্ববোধ কমবেশী সবারই আছে। সেই সুবাদে তাঁর মনে যদি এতটুকু দয়ার উদ্রেক হয়ে মাছগুলো পানিতে ছেড়ে দেয়ার সদিচ্ছায়ই জাগে তাতে আর ক্ষতি কী? বরং কিছু প্রাণ নিরাপদে বেঁচে থাকার সুযোগ কওে দেওয়ায় তাতে যে একটা অচিন্তিতপূর্ব অন্তর্দীপনের কারণে যদি মনে কিছু অনুরঞ্জন হয়ে থাকে, পরহিত ব্রতের কারণে মনে প্রশান্তি র স্বচ্ছ ও শান্ত নীরের একটা অমলিন সরোবর তৈরী হয় তাহলে তাতে বরং অবিস্মরণীয় ও অবিমিশ্র উদাহরণ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপিত হলো। এটা হলো আমাদেও তিনজনের এক বছর একান্নবর্তী জীবনের ঘটনাপ্রবাহের একটা।

এবার দ্বিতীয় ঘটনাপ্রবাহের কাহিনী দেখা যাক। যেহেতু সুদীর্ঘ অতীতের স্মৃতিচারণ, তাই দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে এখানেও দেয়া সম্ভব হলো না। শুধু ঘটনা প্রকাশ করার আগ্রহ থেকেই স্মৃতিচারণ করা মাত্র। সম্ভবতঃ আশ্বিন কি কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা হবে। কারণ যতদূর মনে পড়ে বর্ষা প্রায় শেষ বলতে হবে। যেহেতু গ্রামের রাস্তঘাটে কর্দমাক্ততা কমে গিয়ে প্রায় শুকনো অবস্থা প্রাপ্তি ঘটেছিল। মোটামুটি বলতে গেলে দুটি ঘটনা যৎসামান্য সময়ের আগে পিছে করে হয়েছিল।

যেদিন দুপুরের খানা খাওয়ার পর আমরা তিনজনেই নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম। এরই মধ্যে দেখা গেল, হঠাৎ করে কী একটা দুর্গন্ধ যেন নাকে লাগছে। সাথে লারমাবাবুর চৌকির নীচে খট খট শব্দও শোনা যাচ্ছিল। তখন তিনি বিছানায় উপুর হয়ে তাঁর চৌকির নীচে দেখার জন্য যেই মুখটা চৌকির দিকে করলেন, অমনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, 'এই যে একটা কান পঁচা কুকুর।' ঘায়ে পোকার বিড়বিড়ানির যন্ত্রণায় হয়তো মাঝে মাঝে মাথাটা ঝাঁকাচ্ছিল। আর তদ্বারা ক্ষণ পর চৌকির নীচ থেকে খটখট শব্দটা উঠে আসছিল।

পার্টিশনের পশ্চিম পার্শ্বে ছাত্ররা পঁচা কুকুরের কথা শুনে সামনে যে যা পেয়েছে, লাঠি, বাঁশ, গাছ ইত্যাদি হাতে নিয়ে সদলবলে এসে কুকুরটাকে তাড়াবার জন্য অভিযান শুরু করে দিলো। কিন্তু না, কুকুরটা যেন মরে যাবে তবু বাহির হবে না ভাবের একটা দৃঢ় সংকল্প বুঝিবা তার মনে ছিল। তাই দেখা গেল, এই চৌকির নীচ থেকে বাহির হয় তো সেই চৌকির নীচে ঢুকতে লাগলো, এমনি অবস্থা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত লাঠি দিয়ে, বাঁশ দিয়ে গুটোগুটি করে চেষ্টা করলো, তারপরেও যখন বাহির করে দিতে পারলো না, তখন লারমাবাবু দপ্তরী রমানাথকে ডেকে বলে দিলেন, 'এই রমানাথ, তুমি তাড়াতাড়ি চুলায় পানি গরম হতে দাও এবং সেই সময়ের মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে আমার কথা বলে ঘা ধুয়ে ফেলার ঔষধ এবং ঘা শুকাবার ঔষধ নিয়ে এসো।' রমানাথ দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল এবং প্রায় আধ ঘন্টা পরে গরম পানির পাতিল আর ঔষধের প্যাকেট সার্টের পকেটে করে নিয়ে এসে হাজির হলো। তারপরে রমানাথকে সাথে নিয়ে একটানা প্রায় এক ঘন্টার মতো সময়ের মধ্যে কুকুরটার বাম কানের ঘা'টা গরম পানিতে তুলা ভিজিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে দিলেন এবং তারপরে শুকনো তুলা দিয়ে মুছে ফেলে ঘা শুকাবার পাউডার ঘা'য়ে ছড়িয়ে দিয়ে কুকুরটাকে পুনারায় নিজের হাতে ঠেলে তাঁর চৌকির নীচে ঢুকিয়ে দিলেন। কুকুরটাও এই সযত্ন সেবা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে আরামে স্বস্তিও নিঃশ্বাস ফেললো যেন।

এর পরে প্রত্যেহ সকাল এবং রাত্রে দৈনিক দুইবার ঘা'টা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ঔষধ ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় ২০/২৫ দিনের মধ্যে ঘা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল। আর তদবধি কুকুরটা শ্রী লারমাবাবুর এমন ভক্ত এবং বাধ্যগত হলো, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, তিনি যা এবং যেইভাবে নির্দেশ দিতেন ঐভাবে চুপ করে কুকুরটা সে আদেশ পালন করতো। এই যেমন, হয়তো কুকুরটা হাটাচলার পথে আছে, আর শ্রী লারমাবাবু বলে দিলেন যে, ঐদিকে শুয়ে থাকো, দেখা গেলো যেন বাচ্চা থেকে শেখানো অভ্যাসমতন চুপ করে উঠে যেয়ে যেদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেদিকে যেয়ে সেভাবে বসে পড়লো বা শুয়ে পড়লো ইত্যাদি। তারপর থেকে আমি যতদিন দীঘিনালা স্কুলে ছিলাম, ততদিন পর্যন্ত দেখলাম শ্রী লারমাবাবু স্কুলে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনে প্রায় পায়ের কাছে কাছে থেকে কুকুরটাও যাচ্ছে এবং তিনি স্কুল থেকে ফিরছেন, আর কুকুরটাও ঐ একই কায়দায় তার পিছু নিয়েছে।

একটা ইতর প্রাণী থেকে এককালে সেবাদানকারীর প্রতি যে একটা আনুগত্য এবং আস্থা স্থাপন করার মধ্যে প্রাণে প্রাণে কী অকৃত্রিম হৃদয়বৃত্তির একটা অনুপম আকর্ষণ বা কোন অনুভূতির অনুভব হতে সৃষ্ট মনের মমত্ববোধের চিন্তন ও মনন শক্তি থেকে চেতনাপ্রাপ্ত তা ভেবে দেখার বিষয় নহে কি? এখানে বাগারম্বরও কিছু নেই এবং শ্রী লারমার প্রশংসার অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জিত বাঙ্ময় রূপদানেরও কোন অভিব্যক্তি নেই। বরং ইহা কুকুরটার প্রতি তাঁর অকপট সহানুভূতি সম্পন্ন অন্তঃকরণের একান্ত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত আচরণের জন্য তাঁর প্রতি কুকুরটারও প্রতিদেয় প্রতিফলদান বলে বিবেচনা করা যায়। মাগুরমাছ দেখলে যেখানে মানুষের খাবার আসক্তি বাড়ে, পঁচা কুকুর দেখলে মুখে থু থু আসে, সেখানে কোটির মধ্যে কয়জনে এমন নির্মল করুণার স্নিগ্ধ পরিমন্ডল সৃষ্টি করে হাতের কাছের ভোগ্যবস্তুকে কত মমতাভরে নিরাপদে বিচরণক্ষেত্র তৈরী করে দিতে পারেন; আর দুর্গন্ধে যেখানে মানুষ নাক সিটকায়, দুর্গন্ধ ছড়ানো প্রাণি বা জিনিসটাকে আবর্জনা ভেবে বিদূরীত করার প্রচেষ্টা চালায়, সেখানে তিনি স্বহস্তে পঁচা কুকুরটাকে সেবা দানে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুললেন। এই ঘটনাগুলি কি শুধু অচিন্তিতপূর্ব বলা হবে, নাকি অশ্রুতপূর্বও বলা যাবে?

ইতর প্রাণী ও একটা ভোগ্যবস্তুর প্রতি যাঁর হৃদয়কন্দরে এত অনুকম্পা, সাধারণ মানুষের জন্য, মেহনতিদের প্রতি তাঁর কতখানি মাঙ্গলিক মমত্ববোধ এবং তাতে তিনি অবহেলিত, বঞ্চিতদের জন্য কি রকম জলদ-মন্ত্র রবে কথা বলতেন, তাঁর সান্নিধ্যে না আসা পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আবার তিনি শুধু জুম্মকেন্দ্রীক না হয়ে দেশের আপামর উপেক্ষিত লাঞ্ছিতদের কথা ভাবতেন। কারণ তিনি নিজের আয়েশ বা উচ্চাভিলাসী স্বপ্নের রঙিন চশমায় কোন কিছুর দিকে না তাকিয়ে পরহিতব্রতের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি দিয়েই সবকিছুর মূল্যায়ন করতেন এবং তার যথার্থ রূপদানের মধ্য দিয়েই তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। তজ্জন্যই হয়তো বাংলাদেশ সম্পর্কিত গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে বলতে পেরেছিলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামুহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে, নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি।' এ কথাতে তাঁর শুধুমাত্র জুম্ম জাতির জন্য ব্যথা ভারাক্রান্ত অন্তরাত্মার রোদন ফুটে উঠেনি বরং সমগ্র বাংলাদেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগণের জন্য তাঁর ঐকান্তিক সদিচ্ছার সুগভীর সমবেদনা প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সম্পর্কে শক্তিপদ ত্রিপুরাবাবুর একটি যথার্থ উক্তি হলো 'এম এন লারমাকে চিনতে হলে তাঁর জীবনের সমস্ত দিককে দেখতে হবে। অখন্ডভাবে না দেখে খন্ডভাবে দেখা হলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে চেনা যাবে না।'

শক্তিপদ ত্রিপুরাবাবুর আত্মানুসন্ধানের খাতিরে একটা প্রশ্ন হলো, 'আমরা লারমার সৈনিকরা এম এন লারমার সংগ্রামী চেতনা, সংগ্রামী জীবন, তাঁর মিতব্যয়িতা, বিনয়, তাঁর সহজ, সরল জীবন, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারা, জীবপ্রেম, তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য, তাঁর ক্ষমাগুণ, তাঁর অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের নৈপুণ্যতা, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি গরীব মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দূরদর্শিতা, সাংগঠনিক সততা আমরা কতটুকু শিখতে পেরেছি?'

অথচ এই হাস্যময়, শিশুর মত সহজ ও সরল অন্তঃকরণের, ক্ষান্তি, মৈত্রী আর মুদিতায় পরিপূর্ণ আধার স্বরূপ, ফুলের মত অতি কোমল এবং নিষ্পাপ, নম্র এবং সদালাপী মহান ব্যক্তিত্বকে এক শ্রেণীর লোক অকারণে পৃথিবীর বুক থেকে অপসারণ করে দিয়ে জাতীয় ভাগ্যাকাশ কলঙ্কের বিজয় তিলকে ভরিয়ে দিলো। কী নিষ্ঠুর এই সংসার! কী নির্মম তার পরিহাস! কী হৃদয় বিদারক তার পরিমন্ডল! মানুষ মানুষের কাছে কত অসহায়! ♦

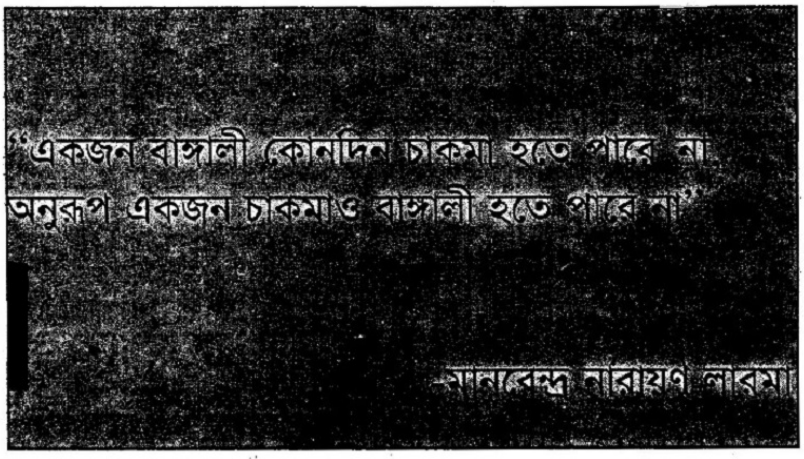

এম এন লারমা আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং মুক্তির প্রতীক...

পি বি কার্বারী

আমাদের প্রয়াত নেতা এম এন লারমা। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার অনেক কিছুই মনে পড়ছে...। মনে পড়ছে তার চেহারা। তার হাসিমাখা মুখ, চোখ। ধীর স্থির, শান্ত ভাব। অমায়িক ব্যবহার। তাঁর কথাবার্তা, আরও অনেক কিছু ...।

তিনি আমার চেয়ে এক বছর সিনিয়র লেখাপড়ায়। সম্পর্কে আমি মামা, তাঁর মায়ের দিক থেকে। তাই আমাকে মাম্ ডাকতেন। আমিও তাঁকে মাম্ ডাকতাম। এটা সম্ভবতঃ অতি ঘনিষ্ঠতা/কোচপানার কারণে। বাকী দু'ভায়ের সাথেও মাম্ ডাকাডাকি করতাম। তাঁর ছোট ভাইও (সন্তু বাবু) ক্লাশ নাইন থেকে আমার সহপাঠী। ১৯৫০-৫৮ পর্যন্ত আমি রাংগামাটিতে ছিলাম... স্কুলে। ছুটিতে পানছড়ি (বাড়ি) যাওয়া-আসার পথে তাঁদের বাড়িতে উঠতাম, থাকতাম। একারণে তাঁরা আমার অতি ঘনিষ্ঠ, পরিচিত।

সিনিয়র হওয়ার কারনে তখনকার রেওয়াজ মোতাবেক, দেখা হলেও কথাবার্তা কমই হতো। ষষ্ঠ দশকের শেষ দিকে তাঁর সাথে দেখা হয় চট্টগ্রামে। বাগেল রোডে, ট্রাইবাল স্টুডেন্টস মেসে। অন্যান্যদের সাথে তিনিও সেখানে থাকতেন। জানতাম, শুনতাম তিনি প্রগতিশীল রাজনীতি করেন। এ কারণে কারাবরণও করেন। জানতাম পারিবারিকভাবে তারা প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক (কৃষ্ণকিশোর, হরিকিশোর, চিত্তকিশোর.... প্রমুখ)। তাই তাঁর প্রতি আমার একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল।

সেখানে দেখেছি তিনি সকলের সাথে মেলামেশা করেন। কথাবার্তা বলেন। বই পড়েন প্রচুর। গল্প-গুজবেও থাকেন না। হাসি-ঠাট্টা করেন না। হাল্কা কথাও বলেন না। হাসিমাখা মুখে কথাবার্তা বলেন, তবে সিরিয়াসলি। এবং কনস্ট্রাকটিভ। পোষাক-আষাক মার্জিত, গোছগাছ। তিনি কথায় ব্যবহারে অমায়িক, স্বাভাবিক। কৃত্রিমতা, বাহুল্য কিছুই নেই। ধীর-স্থিরভাবে কথা বলেন, বক্তব্যও পরিস্কার, সুস্পষ্ট এবং দৃঢ়।

সত্তর দশকের প্রথম দিকে তিনি আমার প্রতি আগ্রহী হন বলে মনে হয়। আমি তখন রাংগামাটির কাঠালতলীতে থাকতাম.... সপরিবারে। তিনি আমার বাসায় মাঝে-মধ্যে বেড়াতে আসতেন। বলতেন, "মাম্, কেমন আছো? ভালতো? পরিবারসহ সুখে আছতো ? ইত্যাদি, ইত্যাদি".... ।

তখন আমি রাংগামাটি কলেজে... অধ্যাপনায়। রাজনীতি করতাম না। আদিবাসীদের জাগরণের সময় আমি ঘুমাচ্ছি.... এমন মনে করেও তিনি হয়ত এরকম বলতে পারেন।

প্রফেসর মংসানু চৌধুরীসহ আমি এক কি দু' বার তাঁর (মামার) বাসায় গেছিলাম। এরপরে দু'একবার গেছিলাম প্রফেসর যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে নিয়ে। তখন তিনি আমার সাথে সিরিয়াসলি রাজনৈতিক আলাপ করেন। তাঁর রাজনীতির রূপরেখা দেন। স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নীতি-কৌশলের কথাও বলেন। তাঁর কথায় ছিল আশাবাদ। আর দ্বান্দিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা। আমার এখনও মনে আছে, তখন কোন এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "দ্বিয়ান পাথর ঘষাঘষি গল্যে, বানা সিগন পাথরব্যা ক্ষয় ন-অয়, ডাঙর পাথরব্যাও ক্ষয় যায়।" অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "গদ্দনাব্যাৎ বেড্-তোই ঘজিল্যেও, ত মাম্যা হোনদিন ন-ক্ষেমিব।" এসব কথা থেকে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন আপোসহীন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । পরবর্তীকালে তাঁর সাথে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে মতাদর্শগত এবং কিছুটা কৌশলগত দিক থেকে তাঁর সাথে আমার মতের তেমন অমিল ছিল বলে মনে হয় না। আমি তাঁকে ভালবাসি। তিনি যখন শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন, এতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। স্বজাতির স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির জন্য রুনু খাঁ এবং কৃষ্ণ কিশোর এককালে আমাদের নেতা ছিলেন। এ যুগে আমাদের অবিসংবাদিত নেতা হচ্ছেন এম এন লারমা। তিনি বহুগুণে গুণান্বিত, সফল নেতা এবং চির অমর থাকবেন।

তিনি উগ্র বৃহৎ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত আদিবাসীদের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। আদিবাসী উৎখাত (Ethnic Cleansing) থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এই উদ্দেশ্যে আদিবাসী জাতিসত্তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যু বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই হৃদয়বিদারক। এটা আমাদের বিরাট অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর স্বপ্নকে পূরণের জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কামনা করছি- তাঁর পুনরাবির্ভাব হোক... যুগে যুগে আদিবাসীদের জন্য।♦

তোমার বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গে আলোকিত হোক ধরণী

সুদীর্ঘ চাকমা

শ্রদ্ধেয়

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,

আজ ১০ নভেম্বর। ঠিক তেইশ বছর আগে এইদিনে আটজন বীর সহযোদ্ধাসহ বিভেদপন্থী কুচক্রীদের হামলায় শাহাদাত বরণ করেছিলে। সেদিন বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ঠ নিম্নচাপের ফলে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ছিল। প্রকৃতি তার সন্তানের অস্বাভাবিক মরণে হয়ে উঠেছিল বিক্ষুব্ধ। চিরবিদায়লগ্নে কেঁদেছিল অঝোরে। জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে এ বিপদ সংকেত শুধু প্রাকৃতিক ছিল না, রাজনৈতিকও বটে।

তোমার মৃত্যুতে গোটা জুম্ম জাতি হয়েছিল স্তম্ভিত। জুম্ম জাতির অবস্থা তখন মাঝিহীন নৌকার মত। কিন্তু তোমার প্রদর্শিত পথে জাতিকে অগ্রসর করতে তোমার অনুজরা দৃঢ়তার সাথে হাল ধরেছিল সেদিন। তাইতো জুম্ম জাতি পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার জন্য আজও সংগ্রাম করছে। তোমার মৃত্যু হতে পারে না। তুমি অজেয়। প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে, শোষকের বিরুদ্ধে শাসিতের, অসত্যর বিরুদ্ধে সত্যের লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ হয়ে বেঁচে থাকবে। তুমি ছাত্রাবস্থায় একাই রুখে দাঁড়িয়েছিলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে। সরকার তোমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে কারা বন্দী করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন সামন্তরা ভোগ-বিলাস আর শোষকের লেজুর হয়ে মেরুদন্ডহীন। আর তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার লক্ষ্যে সংগঠিত করেছিলে ছাত্র-যুব সমাজের। লক্ষ্য পরিপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। উচ্চ শিক্ষিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় তুমি ব্রতী হয়েছিলে।
তুমি আমাদের ধিক্কার দাও। বর্তমান প্রজন্ম আমরা আর তোমাকে ধারণ করতে পারছি না। আমাদের থেকে তোমার দুরত্ব যোজন যোজন। দাউ দাউ আগুনে পুড়ে যাওয়া জুম্ম গ্রাম, রক্তে ভেজা সবুজ জনপদ, সম্ভ্রম হারানো জুম্ম নারীর ছিঁড়ে যাওয়া পিনন-হাদী, হারিয়ে যাওয়া নেত্রী কল্পনা, রাজপথ রাঙ্গানো বরদ্বাজ মনি-ক্যাজই-ইরেন-সুকেশ-মনতোষ ... অগণিত শহীদের রক্ত ছাত্র-যুব সমাজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসের বাইরে এনে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এসে আন্দোলনে সামিল করতে পারে না। যেন নির্জীব পাথরের মূর্তি। জাতীয় অস্তিত্ব যেখানে হুমকি স্বরূপ সেখানে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠায় মগ্ন। আমাদের হাত প্রতিবাদী হয়ে রাজপথ কাঁপায় না, তোমার মতো শত্রুর বিরুদ্ধে রাইফেল হাতে তুলে নেয়ার সাহস পায় না। আমাদের হাত যেন শোষকের দাসত্ব, লেজুরবৃত্তি ও ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের আঘাত হেনে জুম্ম মায়ের বুক খালি করার জন্য। এই হাতগুলোকে তোমার আদর্শই পারে সংগ্রামী ও লড়াকু করতে।

তুমি বুঝেছিলে জুম্ম জাতিকে শিক্ষিত করতে না পারলে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। তাইতো তোমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে শিক্ষা আন্দোলন। তুমি সরকারি পাঠ্যসূচির মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাবদ্ধ রাখনি। অন্ধকারাছন্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির মাঝে শিক্ষা বিস্তারের আলোকবর্তিকা তুমি। শিক্ষাকে তুমি পণ্যরূপে দেখনি। শিক্ষা প্রদানের বিনিময়ে অর্থ কামায় তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। মানব জাতির অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার আর সংগ্রামের ইতিহাসকে মুনাফার বিনিময়ে অন্যকে বিলিয়ে দাওনি। শিক্ষকতা তোমার নিছক কর্মসংস্থান ছিল না, ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা।

তুমি একজন আইনজ্ঞ ছিলে। আইনজীবী নয়। কারণ আইন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করোনি। মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে কত আইনজীবী আদালতে মুখে খই ফোটায়। কোন কিছুর বিনিময়ে তুমি তা করনি। তোমার অবস্থান ছিল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে। যুক্তির আঘাতে সত্য উন্মোচন করতে তুমি। নিপীড়িত ও শাসিতের পক্ষে বাদী হয়ে শোষকশ্রেণীকে করতে আসামী। এই ছিল তোমার বিপ্লবী আদালতের দীক্ষা।

তুমি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত। পথ প্রদর্শক। মহান নেতা। রাজনীতিবিদ। রাজনীতি তোমার কাছে সেবা করা; জনগণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা; কর্মীবাহিনীকে প্রগতিশীল আদর্শে সুশিক্ষিত করা; কুসংস্কার দূরীভূত করা; অবহেলা-বঞ্চনা-নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো; সাম্যবাদের পতাকাতলে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষকে সমবেত করে মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা; সর্বোপরি মনুষত্বের বিকাশ ঘটানো। তুমি ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগিয়েছিলে। সামন্ত ও বিজাতীয় শাসকদের শোষণে নিষ্পেষিত জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলে। জুম্ম সমাজে গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছিলে। বাংলাদেশ যখন সামরিক জান্তাদের বুটের তলায়, বড় বড় নেতারা পালিয়ে বিদেশে, কেউ জান্তাদের দোসর হয়ে ক্ষমতার স্বাদ লেহনে মত্ত, তখন তুমি সবুজ পার্বত্য ভূমিতে সামরিক জান্তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলে। রাজনীতি করে মন্ত্রী হওয়া, গাড়ি-বাড়ি অঢেল সম্পত্তি ও ব্যবসার মালিক হওয়া তোমার লক্ষ্য ছিল না। তোমার লক্ষ্য ছিল- জুম্ম জনগণের

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। স্বপ্ন ছিল- শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমৃত্যু লড়েছিলে অবিচল।

বর্তমানে নেতারা শুধু নেতা নন, অভিনেতাও। কত প্রতিশ্রুতি, কত আশার বাণী, কত মায়াকান্নায় জনগণের সমর্থন আদায় করেন। প্রয়োজন শেষ হলেই বেঈমানী করেন। জনগণের স্বার্থ বিরোধী কর্ম করে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত তারা। রাজনীতি তাদের কাছে ব্যবসা। মুখে আদর্শের লেবাস ধারণ করলেও কথা আর কাজে, তত্ত্ব আর অনুশীলনে, আদর্শ আর জীবনাচরণের ব্যবধান আকাশ আর মাটিসম। তোমার সাথে তাদের তুলনা করি কী করে?

মহান জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলে তুমি। বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুসহ মেহনতী মানুষের অধিকারের দাবী জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলে। সংবিধানে তাদের অধিকার অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়েছিলে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বলেছিলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা। সাংসদ হয়ে জনগণের সাথে তোমার দূরত্ব তৈরী হয়নি। বৈষয়িক লাভের বিনিময়ে জনগণের বিপরীতে কাজ করনি। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে ছিল তোমার রাজনীতি। বর্তমানে সংসদে সাংসদগণ এমন বক্তব্য রাখেন যা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অশ্লীলতা আর কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য শুনে মনে হয় না সেটা মহান জাতীয় সংসদ। তাদের কাছে নির্বাচন মানে পুঁজি বিনিয়োগ। লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া, জয়যুক্ত হওয়া। নির্বাচিত হয়ে বিনিয়োগের দ্বিগুণ, তিনগুণ..., একশগুণ বাড়ানো। তাইতো রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের এত ভীড়। রাজনীতি এদেশে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

প্রকৃতি পুত্র তুমি। প্রকৃতি থেকে প্রয়োজন অতিরিক্ত নিতে না। গেরিলা হয়ে আত্মগোপন থাকাকালেও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলে। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী রক্ষার্থে কত আকুতি ছিল তোমার। আজকে দেশের ভূ-প্রকৃতি ভারসাম্যহীন। সাময়িক লাভের আশায় মানুষ তার বাসভূমিকে বিনাশ করছে। নদীতে পানি নেই, পানিতে মাছ নেই, পাহাড়ে বন নেই, বনে পশু-পাখি নেই, জমিতে ফলন নেই। চারিদিকে 'নেই'য়ের মধ্যে আমাদের বসবাস।

তুমি আমাদের ক্ষমা করো। আমরা তোমাকে বাঁচাতে পারিনি। তোমার মত মহাপুরুষকে কাপুরুষদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। অভাগা জুম্ম জাতি অতি অল্প সময়ের জন্য তোমাকে পেয়েছে। জীবদ্দশায় আমরা তোমার প্রাপ্য সম্মান দিতে পারিনি।

তুমি আমাদের শক্তি দাও। তোমার বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গে যেন আলোকিত করতে পারি নিজেকে, জুম্ম জাতিকে, এই পৃথিবীকে। তোমার অপূরিত লক্ষ্য ও স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। সকল প্রকার সংকীর্ণ ও ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে তোমাকে ধারণ করতে পারি। তোমার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারি জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, তোমায় লাল সালাম। ◆

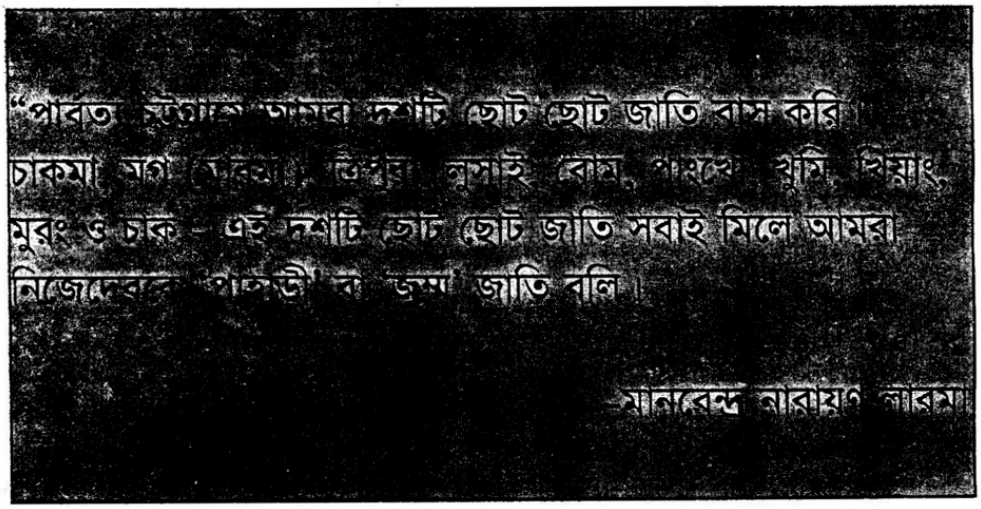

আদিম বর্বরতা ও আধুনিক বর্বরতা

নীলিমা চাকমা

দু'টি মেয়ে, আনুমানিক তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হবে; বেড়াতে এলো আমাদের বাড়ি কল্পতরুতে। সেদিন তারিখটা ছিল ঊনিশশত তিরানব্বই সনের ফেব্রুয়ারী মাসের আটাশ।

একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করার পর বললাম, 'তোমাদের বাবা কী করেন?'

ওদের মধ্যে একজন বলল, 'কী করবে! এই চাষাবাদ আর কি।'

অন্যজন চুপ করে রইল।

'তোমার বাবা কিছু বলছে না যে?'

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটির দু'চোখে বেদনার আভাস দেখতে পেলাম। সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'শরনার্থী বাঙালীরা আমার বাবাকে কেটে ফেলেছে।'

চমকে উঠলাম আমি। কেমন যেন বিব্রত বোধ করলাম। ঐ মেয়েটির হাত ধরে বললাম, '৭১ সনে ২৬শে মার্চ আমার বাবাকেও কতগুলো দু'পেয়ে জন্তু ঘর হতে ডেকে নিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করে। আমার বাবা বেঁচে থাকলে আমাদের জীবনও এরূপ হত না। আমরা সব ভাইবোন আরও লেখাপড়া করতে পারতাম। আমরা তখন না খেয়েও দিন কাটিয়েছি। আমি এখনও আমার বাবার জন্য কাঁদি। আমি তোমার বাবার কথা জানি না। জানলে জিজ্ঞাসা করতাম না, কী নাম তোমার?'

'রজনীকান্তবাবু'

আমার দ্বিতীয়বার চমকানোর পালা। এ ঘটনা আমি শুনেছি। স্থানীয় জেলা পরিষদ তখনও হয়নি। যতদূর মনে পড়ে ৩০শে জুন ১৯৮৮ সনের ঘটনা। পরে রজনীকান্তবাবুর স্ত্রীর মুখে আমি বিস্তারিতভাবে যা শুনেছি তাই লিখছি-

'রজনীকান্তবাবু ছিলেন আটরকছড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন মেম্বার। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, জায়গা, জমি, বাগান প্রচুর। গ্রাম করল্যাছড়ি। চার ছেলে ও সাত মেয়ের পিতা তিনি। করল্যাছড়ি গ্রামে যেতে হলে মাইনীমুখ অথবা লংগদু পর্যন্ত লঞ্চে যেতে হয়। তারপর নৌকায় করে আটরকছড়া (ছোট নদী) দিয়ে করল্যাছড়ি গ্রাম। ঘটনার দিন তিনি তার দু'সন্তান, বড় ছেলে ও বড় মেয়েকে অনিল ও সুমিত্রা নবম শ্রেণীতে পড়ে এদের নিয়ে রাঙামাটিগামী লঞ্চে তুলে দিতে আসেন। ওরা রাঙামাটি মোনঘরের ছাত্র/ছাত্রী। মাইনীতে ছেলেমেয়েদের লঞ্চে তুলে দিয়ে তিনি একটি নৌকায় উঠেন। সবসময়ই তিনি ঐ নাসির মাঝির নৌকাতে চড়েন। পিতা-পুত্র তিনজনে নৌকাটি চালায়। সেই নৌকাতে আরও আরোহী হয় সুরেশ কান্তি চাকমার বিধবা স্ত্রী ব্রজবালা ও তার তিন চার বৎসরের দু'টি ছেলে মেয়ে। করল্যাছড়ি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা কালাদেবী, নিধিবালা এস এস সি পাশ ঐ গ্রামে ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট পড়ান। নিধিবালার একজন ভাইপো, বয়স ১৫ বৎসর হবে। সেও ছিল। উদয় শংকর নামে একজন যুবক, বয়স ১৯ বৎসর। বামে আটরকছড়া গ্রামের হেডম্যানের নাতি টোকি নবম শ্রেণীতে পড়ে। আরও ছিল করল্যাছড়ি স্কুলের মাস্টার দীলিপ মাস্টার, বাঙালী হিন্দু, চট্টগ্রামের কোন এক স্থানে তার বাড়ি।

যখন নৌকাটি কালাপাকজ্যা নামক স্থানে আসে, তখন পূর্ব হতে প্রস্তুত শরণার্থী বাঙালীদের অনেকগুলো নৌকা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং পুরুষদের হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র দীলিপ মাস্টারকে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি অনেক কষ্টে হেঁটে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে পরে করল্যাছড়ি গ্রামে পৌঁছেন। এই হত্যাকান্ডের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার অভাবে তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি সেই সময়ে। মেয়েদের নিধিবালা, কালাদেবী ও টোকিকে গুলশাখালী-ভাঙামুড়া ইত্যাদি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া হয়। পরে নিধিবালা আত্মহত্যা করে। টোকি দু'সন্তানের মা হয়। কালাদেবীর খবর কেউ জানে না।'

'কেন এই হত্যাকান্ড বলে তোমার মনে হয়?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমাদের জায়গায় আর্মিরা ক্যাম্প তৈরী করেছে এবং এক একর জমি তৎকালীন মেজর নিজে বাঙালীদের বর্গাচাষ দেন ও টাকা আত্মসাৎ করেন। সেই বাঙালী চাষীদের নাম গফুর, সিরাজ। এই সিরাজের সাথেই রজনীকান্তবাবুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং সেটেলার সিরাজ জয়ী হয়। রজনীকান্তবাবু মামলা করেন। আমার ধারনা তারাই হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। বর্তমানে আমাদের চব্বিশ কানি জমি তারা বেদখল করে আছে। হত্যাকান্ডের পর আর্মিদের তরফ হতে তাকে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।'

মেয়ে সুমিত্রা আর লেখাপড়া করেনি। অস্বাভাবিক অবস্থায় তিন চার বৎসর ছিল, বাবার জন্য শুধু কাঁদত। পুত্র অনীল শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

অনেক বৎসর পূর্বে একটা ম্যাগাজিনে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম। লেখকের নাম ভাল মনে নেই, 'আমিই সে'। কাহিনী আদিম যুগের। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর অতর্কিত আক্রমন করে। তারপর বিজয়ী দলে বিজিত দলের শিকার করা মাংস আর নারীদের নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে। আর এই পার্বত্য চট্টগ্রামে শিকার মাংসের স্থানে এসেছে জমি। কিন্তু নারী ভাগ্য অপরিবর্তিত।

কে গ্যারান্টি দিতে পারবে যে, একদিন আমার মেয়ে, আপনার মেয়ের ভাগ্য ঐ নিধিবালা, কালাদেবী, টোকির ভাগ্যের সাথে এক হয়ে যাবে না?♦

ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি

মিলিন্দ মারমা

ছাত্রজীবনে রাজনীতি করা উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে বিতর্কের ঝড় কম উঠেনি। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কিনা- এ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও এ প্রশ্নটা উঠা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ কমবেশী সকলেই অধিকার চায়। কিন্তু মুশকিলটা হলো সকলেই আন্দোলনে অংশ নিতে চায় না। বিশেষতঃ 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' এই আপ্তবাক্যটিতো আমাদেও সমাজে এখনও সুপ্রচলিত। তবে প্রচলিত ধারণানুসারে এই 'অধ্যয়ন' বলতে শুধুমাত্র বইপত্র অধ্যয়নকে বুঝলেই চলবে না। সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশেষণ করাটাও অধ্যয়নের অন্তর্ভূক্ত। মরুভূমিতে যখন বালুঝড় উঠে তখন উটপাখি তার মাথাটা গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে মনে করে কোন কিছুই ঘটছে না। এ কারণে মরুভূমিতে প্রায়শঃই উটপাখির জীবন্ত সমাধি ঘটে থাকে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ছাত্র-যুব সমাজের অধ্যয়ন যদি শুধু নির্ধারিত বইপত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে উটপাখির ভাগ্য বরণ করে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না।

রাজনীতিমুক্ত কোন জীবনধারা, রাজনীতি বহির্ভূত বা রাজনীতি-নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোন জীবন, সে ছাত্র হোক, শ্রমিক হোক, কৃষক হোক, পুরুষ হোক, নারী হোক- কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা সমাজ কিভাবে চলবে তা রাজনীতিই নির্ধারণ করে দেয়। একটা সমাজব্যবস্থায় অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন-কানুন, রীতি-নীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য- এসবকিছুই রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়া বা কমা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। তার মানে রাজনীতির দ্বারাই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের চাকুরী পাওয়া না পাওয়া, শিক্ষাজীবন, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সিলেবাস, মাতৃভাষায় শিক্ষাপদ্ধতি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা, স্কলারশীপ, ভূমি অধিকার, সামরিকায়ন, বহিরাগত বাঙালী সেটেলার পুনর্বাসন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন, চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, সবকিছু নির্ধারণ করে রাষ্ট্র এবং নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রেও নীতির ভিত্তিতে। তাহলে এই রাজনৈতিক প্রভাব থেকে আমরা বাইরে কী করে থাকতে পারি? আবার জুম্ম জনগণের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকবে কিনা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কতটুকু থাকবে- সবই রাষ্ট্রেও বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে একটা শ্রেণী কর্তৃক অন্য একটা শ্রেণীকে শোষণ, শাসনের হাতিয়ার, সেহেতু নিরপেক্ষ সেজে বসে থাকাটার অর্থ হলো শোষণ-শাসন যেমন চলছে, তাকে নির্বিচারে মেনে চলা। 'কপালের লিখন না যায় খন্ডন' বা 'পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল' হিসেবে সবকিছু মেনে শাসকশ্রেণীরই রাজনীতি। এর বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন তা শোষিত-শাসিত শ্রেণীর রাজনীতি। ছাত্র সমাজকে এই রাজনীতিরই ধারক বাহক। ফরাসী বিপব, রুশ বিপব, চীন বিপব, ভিয়েতনাম বিপব প্রভৃতি বিপবের ঝান্ডা ছাত্র-যুবকরাই বহন করেছিল। ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র-যুবকরাই হচ্ছে সবচেয়ে অগ্রনী। এ কারণেই মাও সেতুং বলেছিলেন, 'যুবকরাই হচ্ছে গোটা সমাজের সবচেয়ে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি। শিক্ষাগ্রহণে তারা সবচেয়ে আগ্রহশীল আর তাদের চিন্তাধারা সবচেয়ে কম রক্ষণশীল।'

মূলতঃ সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রাম- এই দুই ধরণের সংগ্রামের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে জ্ঞানের ভান্ডার। সুতরাং এই সংগ্রামকে বাদ দিয়ে যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না। সে শিক্ষা আসতে পারে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত থাকলে। এ সংগ্রামের নামই হলো বিপবী রাজনীতি। নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালোবাসাই এই বিপবী রাজনীতির উৎস। এই রাজনীতি এক উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার। এ কারণেই চেগুয়েভারা বলেছিলেন, 'হাস্যকর ঠেকতে পারে এই ভয় সত্ত্বেও আমাকে বলতে দাও একজন সত্যিকার বিপবী পরিচালিত হয় ভালোবাসার বিশাল বোধের তাড়ায়।' এই ভালোবাসা থেকেই তিনি বিপবের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এই ভালোবাসা থেকেই প্রয়াত নেতা এম এন লারমা জেল খেটেছিলেন কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে, সর্বোপরি প্রাণ দিয়েছিলেন জুম্ম জনগণের জন্য। এই ভালোবাসা অর্জন করতে হয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আর এই সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে ছাত্র-যুব সমাজকেই। মেকিয়াভেলী বলেছিলেন, '..সাবধানী হওয়ার তুলনায় দুর্দান্ত হওয়া ভালো। পক্ষান্তরে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ছাত্র-যুব সমাজ নির্লিপ্ত ও নিশ্চুপ থাকতে পারে না। এ কথাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র-যুবসমাজের জন্য প্রযোজ্য। জুম্ম জনগণের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ এই ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের কারণে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে সমগ্র জুম্ম জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ সর্বাগ্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জুম্ম জনগণের উপর যখন সীমাহীন শোষণ-নিপীড়ন নেমে আসে তখন পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে ছাত্র-যুব সমাজ তার ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল। ১৯৮৯ সালে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিনিধিত্ব করার অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষা, সংহতি, সাম্য, প্রগতির মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ। জন্মলগ্ন থেকেই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিসহ সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক গণমুখী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষব্যবস্থার দাবির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধানের দাবী জানিয়ে আসছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন প্রকার মানবাধিকার লংঘন, গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ, ধর্মীয় পরিহানি, সেনাশাসন প্রভৃতি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। এসব ঘটনা তাদের অবচেতন মনে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুরকে জাগিয়ে তোলে। জুম্ম জনগণের চরম দুর্যোগ ও অবলুপ্তির ক্রান্তিলগ্নে আজ নতুনভাবে তাদেরকে সবচেয়ে সচেতন ও সংগ্রামী অংশ হিসেবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে অধিকতর সংগ্রামী দায়িত্ব পালন করতে হবে।♦

আ মি চা ই

পি বি কার্বারী

আমি চাই
ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস হোক,
একটি আর্ন্তজাতিক সংগঠন
বিশ্বাসভাজন ও কার্যকর হোক।

আমি চাই
স্ন্ত্রাসবাদ ধ্বংস হোক।
পরমানু অস্ত্রের বিস্তার রোধ হোক।
মানবাধিকার লংঘন রোধ হোক।
নর হত্যা রোধ হোক।
সংঘাত প্রতিহত হোক।

আমি চাই
সমাজের স্থিতিশীলতা আসুক।
প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াক।
সংক্রামক ব্যাধি ধ্বংস হোক।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোক।
দারিদ্র্য বিমোচন হোক।

আমি চাই
মালয়েশিয়ার মাহাথিরের মতো দেশপ্রেমিক।
দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী
নেলসন মেন্ডেলার মতো সংগ্রামী।

আমি চাই
মিথানল ব্যবসায়ীকে ফাঁসি দেয়া হোক।
উদ্বাস্তুরা সবাই বাস্তুভিটা ফিরে পাক।
কিয়োটো প্রটোকল সফল হোক।
বিশ্বের সকল শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হোক। ◆

প থে র দি শা দি লে ন যি নি

শ্যামল তালুকদার

পথের দিশা দিলেন যিনি
আমরা সবে তারে চিনি
প্রাণভরা তার আশা ছিলো-
স্বপ্ন ছিলো দুর্নিবার,
শাসকদলের দুঃশাসনে
দুর্বিনীত আচরণে
জাগল কাঁপন তাহার মনে
বজ্র শপথ নিবার-
বাঁচার মত বাঁচতে হবে
দুঃখ তবে কারো নাহি রবে
লড়াই করে তা আনতে হবে-
ছিলো কঠিন অঙ্গীকার,
প্রাণভরা তার আশা ছিলো
স্বপ্ন ছিলো দুর্নিবার।
সমুখপানে এগোন নেতা
সঙ্গে ছিলো এই জনতা
আনতে হবে সেই বারতা
সূর্য হতে আলোর ঝলক
ছিনিয়ে নিয়ে আনার-
প্রাণভরা তার আশা ছিলো
স্বপ্ন ছিলো দুর্নিবার।

একদিন এক রাত্রি এলো
জাতির ভালে লিখন ছিলো
সব আশা তার ছিনিয়ে নিলো-
পাহাড় দেশে আসলো নেমে
হঠাৎ ঘোর আঁধার!
ঝড় এলো এক সর্বনাশা
দুঃখ বুকে বাঁধলো বাসা
চুর্ণ হলো সকল আশা
রক্ত নদীর স্রোতের তোড়ে
উঠলো কেঁপে পাহাড়-
পাহাড় দেশে আসলো নেমে
হঠাৎ ঘোর আঁধার।

দুর্ভাগা এই জুম্ম জাতি
হারালো তার মহান সাথী;
লক্ষ জনে শ্রদ্ধা জানায়
সালাম জানায় তার বন্ধুকে,
মহান নেতার নামটি লেখা
মহাকালের সিন্দুকে।
পাহাড় দেশের ভাঁজে ভাঁজে
প্রকৃতির এই কারুকাজে
হাজার ছড়া হাজার নদী
চলছে বয়ে নিরবধি-
পাথর ভাঙার শব্দ বুকে
শুনি যে তার বিরহ শোকে
মনের গাঙে দুঃখের স্রোতে

ভাঙছে এধার ওধার-
পাহাড় দেশে আসলো নেমে
হঠাৎ ঘোর আঁধার,
প্রাণভরা তার আশা ছিলো
স্বপ্ন ছিলো দুর্নিবার।♦

এ শি য়া র মা টি

মৃত্তিকা চাকমা

বল হে তরুণ
এশিয়ার মাটি কার? আমি আদিবাসী, কারণ-
সাক্ষী ইতিহাসের পাতার প্রতিটি ভাঝ
সেটা আমার স্বর্ণের আকর। খুঁজে দেখ-
ঐ যে এখনো উজ্জ্বল শোভা দাপটে অলংকৃত।

বল হে তরুণ
সুদৃশ্য চর্যাপদের ইতিকথা- কাহ্নফা, লুইফা
সুদূর কপিলাবস্তু থেকে আফগান
বার্মা হয়ে থাইল্যান্ড এবং
কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনাম
চিন থেকে জাপান এবং লংকা হয়ে বাংলা
দিনকাল ভালোবাসার স্বপ্নপুরী।

বল হে তরুণ
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যবংশ ইতিকথা হানাহানি এবং
ঘন প্রজাবাৎসল্য বিদ্যমান। ঐ তো
পাল বংশের যুগল ধ্বনি
বুদ্ধং শ্মরণং গচ্ছামি
ধম্মং শ্মরনং গচ্ছামি
সংঘং শ্মরনং গচ্ছামি
বেজে উঠে সারা এশিয়ার মাটি। আর এখন-
কণ্ঠ রোধ। শুধু তোমাকেই চাই-
যেখানে যাই এমনকি আমার রক্ত বিন্দুও
আমাকে চাই। সহনশীলতা বহুদূর
কেবলি শাসানো শব্দ
শুনে হাসি পাই।

বল হে তরুণ
মিথ্যা প্রলোভনে মত্ত আর কতদিন
অপেক্ষায় অপেক্ষায় সবইতো চলে গেল
পাহাড়পুর সোমপুর সোনারগাঁ মহাস্থানগড়।
আর এখন, এ মাটিও যাওয়ার পথে
তারপরেও কী?
দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠবো না
এশিয়ার মাটি আমার এবং
এ মাটি আদিবাসীর, আমিই আদিবাসী।♦

স্মৃ তি সৌ ধ

জ্যোতিপ্রভা চাকমা

১৯৮৩ সনের চার কুচক্রীর
১০ই নভেম্বর লারমার হত্যার স্থলে
দুর্ভেদ্য প্রাচীর পাহাড়- অতন্দ্র প্রহরী সম
পাহাড় ভেদী ছোট নদী বহে
চলে যায় সাগরের সন্ধানে
নদীর তীরে প্রকৃতির স্নিগ্ধ, শান্তরূপ, নির্জনতা
শীতল ছায়া ছোট্ট তটভূমি
নিয়েছি স্মৃতি সমাধির পাশে
আটজন শহীদের স্মৃতি ভাসে
একই গর্তে তাদের নিথর অসাড় দেহ
পাশাপাশি শায়িত শয্যা।
তাঁরা যেন এক মায়ের স্নেহধন্য সন্তান
তাঁদের কেমন যেন মধুর মিলন যাত্রা কোন অজানার দেশে
শ্রান্ত ক্লান্ত ভীতিহীন বদন
ছোট নদীর তীরে তটভূমিতে শহীদের দেহাবশেষ
চিরনিদ্রায় অনন্তকাল ঘুমপাড়ানি,
সেখানে বীর যোদ্ধার দম্ভ
তাদের রক্তে এই সমাধির স্তম্ভ
ইতিহাস তারা, হৃদয়ে সমুজ্জ্বল।
বসুন্ধরার করুণ কান্নায় একাকার
প্রকৃতির হিম ঝিরি ঝিরি হাওয়া যেন রানার হয়ে-
বয়ে নেয় শহীদের চির নিদ্রার বারতা
সুদূরে- অদূরে প্রিয় জনের।♦

স্মৃ তি তে পু ষ্পা ঞ্জ লি

জড়িতা চাকমা

তুমি ক্ষণজন্মা বিপ্লবীনেতা, বিপ্লবী শক্তিধর,
তুমি বঞ্চিত মানুষের সমাজ সংস্কারক;
তোমার শিল্প, তোমার সাধনা,
তোমার অদম্য সাহস প্রেরণার;
দু'হাত জোড় করে করিনু প্রণাম।
তুমি বঞ্চিত, অধিকার হারা মানুষের আলোর দিশারী,
মানবের সেবায়, মানবের মাঝে, রয়েছো বিশ্ব জুড়ে;
আজি এই শোকাহত ভোর বেলাতে ;
শরতের ঘাসে ঝড়া শিশির, শ্রাবনের বারিধারার মত,
অশ্রু জলে, নত শিরে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তোমায় করিনু স্মরণ ।
তুমি শুধু দশ ভাষভাষি জুম্ম জাতির নও,
তুমি সারা বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের সেতু বন্ধন,
আজি এদিনে উৎসব নেই, বিয়োগ রাগিনী নেমে আসে,
আসে প্রতিবাদের দীর্ঘশ্বাস,
রুদ্ধ কণ্ঠ, হারানোর বেদনা।
জুম্ম জাতির কলঙ্ক, চার কুচক্রীদের,
যুগে যুগে ইতিহাস কখনো করবেনা ক্ষমা,
আজি শোকাহত ভোর বেলাতে,
নীরবে এ শোক দিবসের স্মৃতি সৌধে,
জুম্ম জাতি রেখে যায় হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাঞ্জলি।
আজি এই শোকাহত ভোর বেলাতে,
নিকট-জনের বেদনার-অশ্রুত ধ্বনি বাজে,
চার কুচক্রী, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ,
নৃসংশভাবে তোমাকে হত্যা ক'রে,

১৯৮৩ সনে সেই ১০ই নভেম্বরে।
আজি এ শোকাহত ভোর বেলাতে,
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সারি সারি হয়ে,
নীরবে, নিভৃতে, ফুলের মালা হাতে নিয়ে,
শহীদ মিনারে স্মরণ করে তোমায়;
আপ্লুত হয়ে অশ্রু-সজল নয়নে।
ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা..., এই গান খানি নিয়ে,
মধুর সুরে তোমার বাঁশী আর বাজেনা এই দিনে;
নব পল্লবে, নব চেতনায় জাগিয়েছো এ জাতিকে,
চলে গেছো অনেক দূরে এই সুন্দর ভুবন থেকে,
তবুও তুমি রয়েছো জুম্ম জনতার হৃদয় জুড়ে। ◆

কা লো ডা য়ে রী

পপেন ত্রিপুরা

স্মৃতি বিজড়িত এক জুম্ম বৃদ্ধের কাছে
আমি শুনেছি-
'৮১-র ২৩ জুন গোমতী গণহত্যার কথা।
রূপকথার গল্পের কোন এক পূজোতে
জোড়া শ্বেত-ছাগল বলিদানের মতো
বলি দিয়েছিল ওরা-
আমার শত-সহস্র বাবা-মা'দের।
আমি স্পষ্ট দেখেছি-
'৯২-র ১০ এপ্রিল লোগাং গণহত্যার ঘটনা
আমি তা দেখেছি-
এক ইতিহাস তাড়িত কুঁজো বুড়ির চোখে।
আমার বোনের অসহায় দেহটিকে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে শকুনের দল।
সন্তারা-হারা এক মায়ের চোখে আমি দেখেছি
পাহাড়ের গিরিখাদে নামিয়ে,
অসহায় পাহাড়ী মানবদের নিয়ে
পাহাড়ী ভিটেয় ওরা দুর্গোৎসব করেছিল।
কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল
আমার সহস্রাধিক ভাইদের।
ছেলে-হারা জুম্ম মায়ের চোখে জল
আমাকে বলেছে-
'৯৩-র ১৭ নভেম্বর নানিয়াচর গণহত্যার কথা
আমি জেনেছি-
'৭৯-র- কানুনগোপাড়া গণহত্যার কথা,
আমি জেনেছি এসব-
জুম্ম মায়ের চোখের নীলজলে তা।
পঙ্গু এক জুম্ম পিতার চোখে
আমি দেখেছি- আমি স্পষ্ট দেখেছি
'৮৯-র ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার রক্তে
রাঙিয়ে গিয়েছিল কাপ্তাই বাঁধ,
ছড়া, ঝর্ণা আর গিরিখাদ।
এটা আমার কবিতা নয়
আমি জেনেছি এসব
পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক
আমার কালো ডায়রী থেকে।
ইজ্জত হারা সহস্র বোনের চাপা প্রলাপে
আমি জেনেছি- আমি শুনেছি-
তাইন্ডং-ভূষণছড়া-পানছড়ি
কলমপতি-বাঘাইছড়ি-মাল্যা-চংড়াছড়ি
শুধু বাঁচাও বাঁচাও আর্ত চিৎকারে
কম্পিত হয়েছিল আকাশে বাতাসে।
আমি জেনেছি-
এখানে আদিবাসীদের রক্তে
হোলি খেলায় মেতেছিল হায়েনারা ।
বেদনাসিক্ত এক মা আমাকে বলেছে-
গিরিখাদ থেকে তার ছেলের আর্তচিৎকার
এখনো তার কানে এসে আঘাত করে।
চিৎকার করছে-
আমাকে মেরো না, ওরে তোমরা আমাকে মেরো না।
মা'টি আমাকে বলেছে-
'আমার ছেলের আকুতি-মিনতি, কান্না বিজড়িত চিৎকার
ওরা শুনেনি;
ওদের নিষ্ঠুর হৃদয়ে একটুও দ্বিধা বাঁধলো না সেদিন,
সমস্ত দাঁত বের করে হাসতে হাসতে
ওরা- ঐ হায়েনার দল
আমার কলিজার টুকরোকে খেয়ে ফেলেছে।'
এটা আমার কবিতা নয়,
আমি জেনেছি এসব-
'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামক
আমার কালো ডায়েরী থেকে।
'৮৬-র ১৩ জুনে আমিই দেখেছি,
আমি স্পষ্ট দেখেছি-
সমস্ত দীঘিনালা আগ্নেয়গিরি রূপ নিয়েছিল।
আমি দেখেছি সেদিন-
সেটেলার-আর্মির তান্ডবে
আমার প্রিয় গ্রাম 'ভৈরফা'টি
ধ্বংসস্তুপ যেন শ্মশানের মত হয়েছিল।
আমি দেখেছি-
আর্মিও গুলিতে- সেটেলারের দা'এর কোপে
সবুজ ধানক্ষেতে-
আমার ভাইদের মৃত লাশ স্তুপাকারে পড়ে আছে।
ভৈরফা- বোয়ালখালি আর মাইনী
তাজা রাঙা রক্তে রাঙিয়েছিল সেদিন।
আমি দেখেছি সেদিন-
জুম পাহাড়ে দৌড়াতে দৌড়াতে
আমার এক অন্তঃসত্ত্বা মা
নিস্তেজ থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।
আমি দেখেছি-
তার শরীর থেকে পড়া রক্তে
জুম ক্ষেতে রক্তের বন্যা বয়েছিল।
এটা আমার কবিতা নয়
আমি জেনেছি এসব-
'পার্বত্য চট্টগ্রাম' নামক
আমার কালো ডায়েরী থেকে।◆

বন বিভাগের ইকো-পার্ক ও সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফলে ম্রো গ্রামবাসীরা উচ্ছেদের মুখে

কখনো বন বিভাগের ইকো-পার্ক স্থাপন, কখনো বা সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপনের নামে বান্দরবান জেলার চিম্বুক পাহাড়ের প্রায় ১৫টি ম্রো গ্রাম চরম হুমকির মুখে রয়েছে। প্রায় আড়াই শতাধিক ম্রো পরিবার তাদের জুমভূমে জুম চাষ করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেনাবাহিনী কর্তৃক ম্রো গ্রামবাসীদের চলাফেলা, বনজ সম্পদ আহরণ, জীবন-জীবিকা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ বছর সেনাবাহিনীর বাধার মুখে অনেক এলাকায় জুম কেটেও আগুন দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ৬০টি ম্রো পরিবার এ বছর জুম চাষ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর তথাকথিত নিরাপত্তা বেষ্টনী এলাকার মধ্যে ম্রো গ্রামবাসীদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। ফলে ম্রোদের জুম ভূমি মারাত্মক আকারে সংকচিত হয়ে পড়েছে।

জানা গেছে যে, গত ৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর উপস্থিতিতে বান্দরবান জেলা প্রশাসক শেখ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের অফিসে অনুষ্ঠিত এক সভায় ম্রো জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত চিম্বুক পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি ইকো-পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় চট্টগ্রামের বন সংরক্ষক আবুল মোতালেব, বান্দরবানের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অবনিভূষণ ঠাকুরসহ তিন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বিএনপি নেতা ওসমান গণি, আওয়ামী লীগ নেতা কাজী মজিবুর রহমান, মৃত্তিকা সংরক্ষণ কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আবদুল গফুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় চিম্বুক এলাকার কোন ম্রো অধিবাসীকে ডাকা হয়নি কিংবা ম্রো অধিবাসীদের কাছ থেকে কোন মতামত গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে বান্দরবান জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে একজন কানুনগোর নেতৃত্বে বান্দরবান-থানছি সড়ক বরাবর চিম্বুক পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিমাপ করা হয়। বান্দরবান-থানছি সড়কের চিম্বুক পাহাড়ে অবস্থিত কাপ্রু পাড়াকে কেন্দ্র হিসেবে ধরে নিয়ে কাপ্রু পাড়া থেকে বান্দরবান সদর রাস্তার ৮ (আট) কিলোমিটার এবং অপর পক্ষে কাপ্রু পাড়া থেকে থানছি রাস্তার ৪ (চার) কিলোমিটার ব্যাপী মোট ১২ (বার) কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা ইকো-পার্ক এলাকা হিসেবে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু এই সড়কের দুই ধারে কত কিলোমিটার ব্যাপী এই ইকো-পার্ক এলাকা বিস্তৃত হবে তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে বান্দরবান সদর উপজেলার হরিণঝিরি মৌজা, রুমা উপজেলার গালেঙ্যা মৌজা, লামা উপজেলার লুলাং মৌজা ও লেমুপালং মৌজা এবং থানছি উপজেলার সেকদু মৌজার কমপক্ষে ৫,৫০০ একরের মতো জায়গা উক্ত ইকো-পার্কের মধ্যে পড়বে বলে এলাকাবাসী দাবী করেছে। কেবলমাত্র তিনজন ম্রো গ্রামবাসীর রেকর্ডীয় জমি ছাড়া বাকী সব জমি ভোগদখীয় বসতভিটা ও আদিবাসী জুম্মদের জুম ভূমি।

এই ইকো-পার্ক ঘোষণার পর পরই ম্রো গ্রামবাসীসহ বান্দরবান জেলার আদিবাসী জুম্মদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশিত 'পাহাড়ীদের না জানিয়েই ম্রো অধ্যুষিত চিম্বুক হিল রেঞ্জে ইকোপার্কের সিদ্ধান্ত' শীর্ষক সংবাদের ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ বান্দরবান জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু বান্দরবান জেলা প্রশাসক এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরণ করেনি। তবে জুম্ম জনগণের বিরোধীতার মুখে এক পর্যায়ে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (দীপক চক্রবর্তী), বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, পূর্ণচন্দ্র ম্রো, রাংলাই ম্রো, বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রমুখ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে ম্রো অধিবাসীসহ স্থানীয় জনগণের প্রবল আপত্তির মুখে উক্ত ইকো-পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা অনেকটা চুপসে যায় বলে সুয়ালগ ইউনিয়নের চেয়ারমান ও সুয়ালক মৌজার হেডম্যান রাংলাই ম্রো জানান।

কিন্তু উক্ত ইকো-পার্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া চুপসে গেলেও গত ২০০৫ সালের গোড়া থেকে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে উক্ত বান্দরবান-থানছি সড়ক বরাবর চিম্বুক পাহাড়ের ১২ (বার) কিলোমিটার এলাকাকে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘোষণা দিয়ে জবরদখল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এরমধ্যে ৫ (পাঁচ) একর জায়গা সেনা ক্যাম্পের জন্য জেলা প্রশাসকের অফিসে বন্দোবস্তীর আবেদন করা হয় এবং গত বছর সেনাবাহিনীর উদ্যোগে কাপ্রু পাড়া সংলগ্ন এলাকায় 'শান্তিনীড়' নামে দু তালা বিশিষ্ট একটি পর্যটন কটেজ নির্মাণ করা হয়। কাপ্রু পাড়া সংলগ্ন সেনা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় 'নিরাপত্তা বেষ্টনী'র অজুহাত দেখিয়ে সেনাবাহিনী এবছর ৬০টি ম্রো পরিবারকে জুমে আগুন দিতে বাধা দেয়।

গত ৩০ জানুয়ারী ২০০৬ চিম্বুক এলাকার লোকজন সেনাবাহিনীর তথাকথিত 'নিরাপত্তা বেষ্টনী'র নামে জুম চাষে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে। এতে বান্দরবান জেলা থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সাংসদ বীর বাহাদুর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশের প্রাক্কালে গ্রামবাসী কর্তৃক টাঙানো ১০টি ব্যানার সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায় বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। এমনিতর অবস্থায় আশু সুরাহা চেয়ে গত বছরের শেষ দিকে একদল ম্রো গ্রামবাসী বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিজ ম্যামাচিং মারমার নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু আজ অবধি তারা এর কোন সমাধান পায়নি। এমতাবস্থায় ম্রো গ্রামবাসীরা বর্তমানে চরম উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ◆

বান্দরবানের চার গ্রামের বম জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে

১৯৮১ সালে বান্দরবানের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ফারুক আহমেদের সার্বিক সহযোগিতায় এই পাহাড়ে আমাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়। কঠোর পরিশ্রম করে জঙ্গল কেটে গাছ-গাছড়া তুলে জনবসতি গড়ে তুলি। মূল্যবান বাগান-বাগিচা গড়ে তুলে সেই বাগান থেকে ফলমূল বিক্রি জীবিকা নির্বাহ করছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে- প্রায় ২৫ বছর পরে জানতে পারছি যে এই জায়গা বিসিকের। বিসিক এখন আমাদেরকে এই বসতভিটা ও বাগান-বাগিচা ছেড়ে চলে যেতে বলছে। এই জায়গা ছেড়ে দিলে আমাদের মরণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন সুয়ালক মৌজার ফারুক পাড়ায় ফারুক মুন কমিউনিটি সেন্টারে বম সোসিয়েল কাউন্সিল-বাংলাদেশ এর উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সাথে উক্ত চার বম গ্রামবাসীর মধ্যে আয়োজিত ভূমি হরণ সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভায় উপরের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বান্দরবান জেলার সুয়ালক ইউপি মেম্বার পাকদির বম, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাংনল বম ও ফারুক পাড়ার মুরুব্বী বইখুব বম। তারা জানায়, বিসিকের অফিস স্থাপন করা হলে ফারুক পাড়ায় ৩২টি বম পরিবার উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। হারাবে তাদের দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা বাগান-বাগিচা।

বান্দরবান সদর উপজেলাধীন সুয়ালক মৌজার ফারুক পাড়া, লাইমি পাড়া, সারন পাড়া ও গেৎসেমানী- পাশাপাশি এই চারটি আদিবাসী বম পাড়া রয়েছে। ফারুক পাড়ায় রয়েছে প্রায় ১০০ পরিবার বম অধিবাসী। আর লাইমি পাড়ায় ৬৪ পরিবার, সারন পাড়ায় ৬০ পরিবার ও গেৎসেমানী পাড়ায় হয়েছে ৩০ পরিবার বম জনগোষ্ঠী। উক্ত মতবিনিময় সভায় বম গ্রামবাসীরা জানায় যে, শুধু বিসিক কর্তৃক তারা উচ্ছেদের মুখোমুখী নয়, তাদের বসতভিটা, গ্রামীণ সংরক্ষিত বন ও জুম ভূমি লেঃ কর্ণেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম নামে সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তাকে তাদের অজান্তে দীর্ঘমেয়াদী লীজ দেয়া হয়েছে। লীজ বাতিলের ঘোষণা দেয়া হলেও এখনো চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয়নি বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে। অপরদিকে সেই ১৯৭১ সাল থেকে এসব গ্রাম গড়ে তুলে বসবাস করে আসলেও এখনো এসব বসতভিটা ও বাগান-বাগিচা তাদের নামে বন্দোবস্ত নয় বলে তারা জানায়। বন্দোবস্তীর জন্য চেষ্টা চালালেও নানা আইনী জটিলতার কারণে এখনো বন্দোবস্তীর আবেদন পর্যন্ত করতে পারেনি বলে তারা কাতর কণ্ঠে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানায়। এসব জটিলতা অচিরেই নিরসন করে তাদের নামে জমি বন্দোবস্তী এবং তাদের সামাজিক মালিকানাধীন জুম ভূমি ও গ্রামীণ বনভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করার আবেদন জানায়।

তারা আরো জানায় যে, বন বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭১ সালে প্রতি পরিবারকে ৫.০০ একর (৩য় শ্রেণী) জমি প্রদান করে প্রায় ৭০ পরিবার আদিবাসী পরিবার এই চারটি পাড়ায় পুনর্বাসন করা হয়। তম্মধ্যে অধিকাংশ পরিবার নানা কারণে মিজোরাম ও সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে গেছে। অন্যত্র চলে যাওয়ার আগে তারা বর্তমানে বসবাসকারী পাড়াবাসীর (৭০ পরিবার) নিকট কতেক ক্ষেত্রে অর্থে বিনিময়ে কিংবা বিনামূল্যে অর্পণ করে যায়। কিন্তু সরলতার কারণে সেই সময়ে বন্দোবস্তীর নাম পরিবর্তন করা হয়নি। এখন তারা নাম পরিবর্তনের জন্য বা তাদের নামে বন্দোবস্ত প্রদানের আবেদন করতে চাইলে মৌজা হেডম্যানের অফিস ও জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে পূর্ববর্তী জমি মালিকদের স্বশরীরে উপস্থিতি পূর্বক 'না দাবীপত্র' চাওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তীদের মালিকরা যেহেতু মিজোরাম ও সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে গেছে তাদের এখন পাওয়া দুষ্কর। এই আইনী জটিলতার ফলে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বসবাস করে আসলেও এবং বাগান-বাগিচা গড়ে তুললেও তারা এখনো জমির মালিক হতে পারেনি। এমতাবস্থায় তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরাপর জুম্ম গ্রামবাসীর মতো চিরায়ত ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিতকরণ পূর্বক এই উচ্ছেদ আতঙ্ক থেকে তারা অচিরেই মুক্তি পেতে চান। ◆

বিশেষ প্রতিবেদন

সাম্প্রদায়িক শিক্ষার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আলোকিত মানুষ হতে হবে -জে বি লারমা

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবীন বরণ ও এসএসসি'র কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা শেখায়। এ কারণে জাতীয় চেতনার মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে। আলোকিত মানুষের নেতৃত্বে দেশের সন্ত্রাস, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাদের নেতৃত্বে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করতে হবে। আলোকিত মানুষের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সেনা শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য এম এন লারমার বৈপ্লবিক জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান কলেজ শাখার উদ্যোগে বান্দরবান টাউন হলে আয়োজিত বান্দরবান সরকারী কলেজে নবীন বরণ ও এসএসসি'র কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে নবাগত ও কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান কলেজ শাখার সভাপতি চিংথৈখুই মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীন বরণ ও এসএসসি'র কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, বিশিষ্ট নাট্যাকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপিকা হামিদা বানু, জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক কে এস মং মারমা ও বান্দরবান জেলা সভাপতি সাধুরাম ত্রিপুরা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মংসিংঞো মারমা ও বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি জলিমং মারমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রুবিগ্রু মারমার নবাগত ও এসএসসি'র কৃতি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে জে বি লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি দিন দিন অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এই অঞ্চলের এখনো শান্তি ফিরে আসেনি। পূর্বের মতো এখনো সেনা শাসন বলবৎ রয়েছে। একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। জুম্ম জনগণের অধিকার নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলা খেলছে। তিনি অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আজ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকার আজ যে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছে তা আসলে একমুখী শিক্ষা নয়। তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় ঢাকায় বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে যে মিছিল করা হয় সেই মিছিলে আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়ানো হচ্ছে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদ পাল্টা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দিতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদ ছাড়া বিশ্বে কোথাও মৌলবাদ জন্মলাভ করেনি বলে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে আজ প্রগতিশীল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার ৭০% দেশে আজ প্রগতিশীল শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে। বলিভিয়ার প্রগতিশীল আদিবাসী নেতা ইভো মোরালেস সে দেশে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তিনি বলেন, ইভো মোরালেসের জায়গায় আমরা বাংলাদেশে সন্তু লারমাকে দেখতে চাই। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারাই সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে। তারা বাঙালীর কথা বললেও বস্তুতঃ তারা বাঙালীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আবারও সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তাই তিনি এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তাদের আলোচনা শেষে নবাগত ও এসএসসি'র কৃতি ছাত্রছাত্রীদেরকে উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্জীব দ্রং গান পরিবেশন করেন এবং মামুনুর রশীদ ও রুবি চৌধুরী দু'জনে 'চে'র সাইকেল' নাটকের একটি দৃশ্যের অভিনয় দেখান। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির সভাপতির আগমনের প্রতিবাদে এবং নবীন বরণ ও কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ভন্ডুল করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন কর্তৃক বান্দরবানে ১০ সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন বিকালে তারা বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে তারা পার্বত্য চুক্তি বিরোধী বক্তব্য এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আগত অতিথিবৃন্দের বিরুদ্ধে 'সন্তু লারমার দালালরা, ফিরে যাও ফিরে যাও' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। সমঅধিকারের হরতালের মুখেও শত শত পাহাড়ী-বাঙালী ছাত্রছাত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ♦

বিশেষ প্রতিবেদন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

গত ১১ অক্টোবর ২০০৬ চারদলীয় জোট সরকারের শেষ মুহূর্তে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় এক ঝটিকা সফরে আসেন। ক্ষমতায় আরোহণ করার পর দীর্ঘ পাঁচ বছরে এই প্রথম তিন পার্বত্য জেলায় পদার্পণ করলেও পুরনো-নতুন কিছু প্রকল্প উদ্বোধন ছাড়া তাঁর সফর পার্বত্যবাসীর মনে কোন আশাই জাগাতে পারেনি। উপরন্তু একদিকে খাগড়াছড়ির সাবেক সাংসদ চরম সাম্প্রদায়িক আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পুনরায় প্রার্থী ঘোষণা, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ায় পার্বত্যবাসীর মনে উদ্বেগেরই সৃষ্টি করেছে।

বেগম খালেদা জিয়া প্রথমে খাগড়াছড়ি, তারপর যথাক্রমে রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা সফর করেন। তিনি খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে দু'টি জনসভায় যোগদান করেন। উভয় জনসভায় তাঁর ভাষণে তিনি জোট সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। কিন্তু তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে একটি কথাও উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি বলতে ভুলেননি যে, 'এই এলাকায় পাহাড়ের লোক এবং সমতলের লোক সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। এই সম্প্রীতির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।' এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্রতা ও জুম্ম জনগণের বিশেষ অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেছেন। পক্ষান্তরে তিনি অত্যন্ত সুচতুরভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে উস্কে দিয়ে গেছেন। পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি তাঁর ভাষণে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক পাহাড় ও জমি খালি পড়ে আছে' বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই বিকৃত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সাল থেকে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বসতিস্থাপনের কার্যক্রম শুরু করেন। খালেদা জিয়া তাঁর এই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে সেই জাতিগত নির্মূলীকরণ নীতিরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর সফরসঙ্গী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে 'নারায়ে তকবীর' শ্লোগান দেয়ার মধ্য দিয়ে খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের উগ্র সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী নীতিরই আরেকবার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

খালেদা জিয়ার এই সফর আগাগোড়াই একটি নিষ্ফলা সফর। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন কথা না বলায় শুধু জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীরাই নন, খোদ বিএনপির সদস্যরাও হতাশ ও বেগম খালেদা জিয়ার উপর ক্ষুব্ধ হন।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা, চাকমা সার্কেল চীফ দেবাশীষ রায়, মং সার্কেল চীফ পাইহ্লা প্রু চৌধুরী, বোমাং সার্কেল চীফ এর প্রতিনিধি জিমি চৌধুরী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে রাঙামাটি সার্কিট হাউজে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সন্তু লারমা তিন পার্বত্য জেলায় সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের পক্ষে কিছু জরুরী বিষয় উত্থাপন করেন। জরুরী বিষয়, যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলির কার্যবিধি চূড়ান্তকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে জর্জকোর্ট স্থাপন, সার্কেল চীফ ও মৌজা হেডম্যানদের দপ্তরে আনুষঙ্গিক সহযোগিতা প্রদান, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে বিষয় হস্তান্তর ইত্যাদি।

জানা যায়, তাঁর সফরকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন, যে প্রকল্পগুলোর কয়েকটি ইতিমধ্যে অন্যান্য মন্ত্রীদের দ্বারা উদ্বোধন করা হয়েছিল। খাগড়াছড়িতে তিনি খাগড়াছড়ি গেইট, টাউন বিউটিফিকেশন প্রজেক্ট, টেকনিক্যাল ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট, টুরিজম মোটেল ও ইয়থ ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট উদ্বোধন করেন। অপরদিকে রাঙামাটিতে উদ্বোধন করেন এগ্রিকালচার ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট ও ইয়থ ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট এবং বান্দরবানে উদ্বোধন করেন বান্দরবান বেতার কেন্দ্র, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, সাঙ্গু নদী সেতু, মেঘলা টুরিজম মোটেল ও ভোকেশনাল ট্রেইনিং সেন্টার।♦

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখল ঃ এক নজরে বান্দরবান পার্বত্য জেলার চিত্র

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নিমূর্লীকরণের নীতি হিসেবে শাসকগোষ্ঠী বরাবরই ভূমি জবরদখলের নীতি গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন অপারেশন উত্তরণ-এর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখলের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। নানা উপায়ে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলছে। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে কেবল বান্দরবান পার্বত্য জেলার দিকে নজর দিলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বর্তমান অবস্থায় সর্ব শ্রেণী ভূমির পরিমাণ ৯,৫৯,১৭৪ একর। তম্মধ্যে সাংগু সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল জমির পরিমাণ ৮০,০০০ একর এবং মাতামহুরী সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল জমির পরিমাণ ১,০২,০০০ একর। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নানা উপায়ে ভূমি জবরদখল করা হচ্ছে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- (১) রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদী ইজারা প্রদানের মাধ্যমে; (২) সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে অধিগ্রহণের মাধ্যমে; (৩) রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার মাধ্যমে; (৪) ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধভাবে জবরদখলের মাধ্যমে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা গেল-

১। দীর্ঘমেয়াদী ইজারা

রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদী ভূমি লীজ দেয়া হয়ে আসছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এরফলে হাজার জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসী এখন জুমচাষ করতে না পেরে নিজভূমে পরবাসী হয়ে চরম আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমির ইজারার দেয়া হয়েছে। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো গেল-

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	রাবার প্লান্টেশন		হর্টিকালচার প্লট		মোট	
		প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	প্লট সংখ্যা	জমির পরিমাণ
১.	বান্দরবান সদর	৯১	২,২৭৫	১১৯	২,৮৫৫	২১০	৫,১৩০
২.	লামা	৮৩৫	২০,৮৭৫	১৭৭	৪,৫০০	১০১২	২৫,৩৭৫
৩.	আলিকদম	১৯৪	৪,৮৪৭	৬২	১,৫৫০	২৫৬	৬,৩৯৭
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২	২,৮০০	১৫	৩৭৫	১২৭	৩,১৭৫
মোট ৪টি উপজেলায়		১,২৩২	৩১,৭৯৭	৩৭৩	৯,২৮০	১৬০৫	৪০,০৭৭

২। সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে অধিগ্রহণ

সশস্ত্র বাহিনীর গ্যারিসন স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, যদিও চুক্তিতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো গুটিয়ে নেয়ার বিধান রয়েছে কিন্তু এই চুক্তির স্বাক্ষরের পর প্রায় ৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে একপ্রকার সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনীর গ্যারিসন স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসী নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। নিম্নে এর তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো-

ক্রঃ নং	বিবরণ	জমি (একর)
১.	সুয়ালকে গোলন্ডাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত	১১,৪৪৫.৪৫
২.	সুয়ালোক গোলন্ডাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রক্রিয়াধীন	১৯,০০০.০০
৩.	রুমায় প্যারা কমান্ডো ও এ্যাভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টার প্রক্রিয়াধীন	৯,৫৬০.০০

৪.	বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণ চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন	১৮১.০০
৫.	চিম্বুক পাহাড়ে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনীর পর্যটন কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	৫,৫০০.০০
৬.	বান্দরবান-লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	২৬,০০০.০০
	মোট জমির পরিমাণ	৭৫,৬৮৬.৪৫

৩। রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নামে অধিগ্রহণ

বান্দরবান জেলার ৭টি উপজেলায় ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে গত ১৯৯৮-৯৫ সর্বশেষ ১৯৯৮-৯৯ সালে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসিদের জনবসতি ও জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবন জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন পরবাসী হয়ে পড়েছে।

ক্রঃ নং	উপজেলা	মৌজার সংখ্যা	জমি (একর)
১.	আলিকদম উপজেলায়	৩টি	৫,৭৫৪.৯৮
২.	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়	৩টি	৪,৮৪০.০০
৩.	লামা উপজেলায়	৫টি	২,৭৮০.৯৯
৪.	বান্দরবান সদর	৫টি	১৫,৭৫০.০০
৫.	রোয়াংছড়ি	১০টি	৪৫,৯৫০.০০
৬.	রুমা উপজেলা	৫টি	১১,৫০০.০০
৭.	থানছি উপজেলায়	৪টি	৭,৫০০.০০
মোট ৭টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজায় জমির পরিমাণ			৯৪,০৬৬.৯৭
প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে রয়েছে জমির পরিমাণ			২৩,৯৩৩.০৩
মোট বন বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য দখলকৃত জমি			১,১৮,০০০.০০

যথুরাম ত্রিপুরা যৌথখামার পাড়া ও আনন্দ চাকমা যৌথ খামার পাড়াবাসীকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া

১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলিকদম উপজেলার কামতিছড়া গ্রামের ৫০ টি ত্রিপুরা পরিবার ও ৫০ টি চাকমা পরিবারকে প্রত্যেক পরিবারকে ৫.০০ একর করে তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড় বন্দোবস্তী কবুলিয়তসহ প্রদান করে বান্দরবান সদর থানাধীন টংকাবতী ইউনিয়নের টংকাবতী মৌজায় পুনর্বাসন করা হয়। উক্ত পরিবারগুলো যথুরাম ত্রিপুরা যৌথখামার পাড়া ও আনন্দ চাকমা যৌথখামার পাড়া- এই দুইটি নাম ধারন করে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত স্ব স্ব জায়গার উপর বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, বাগান-বাগিচা সৃজন করে বসবাস করে আসছে। ইতিমধ্যে সেখানে সেগুন, গামারসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছগুলো অনেক বড় উঠেছে। আর তাতেই শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে পার্শ্ববর্তী বহিরাগত বাঙালীদের।

উল্লেখ্য যে, পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলা থেকে আগত বহিরাগত বাঙালীরা বেশ কিছু দিন ধরে উক্ত দুই পাড়ার লোকদের উচ্ছেদ করার জন্য বিভিন্নভাবে হয়রানিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এসমস্ত জায়গা তাদের মর্মে দাবী করছে। আরও উল্লেখ্য, আয়ুব আলী, পীং- সোনামিয়া, সাং- নাপাতিলা, উপজেলা- লোহাগাড়া, জেলা- চট্টগ্রাম বেশ কিছুদিন ধরে যথুরাম ত্রিপুরার ২২ বৎসর বয়সের সেগুন বাগান এখন তার মর্মে দাবী করছে। উক্ত আয়ুব আলী যথুরাম ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বান্দরবান জেলা প্রশাসক ও থানায় নানা অভিযোগ করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। বর্তমানে উক্ত দুই গ্রামের অধিবাসীরা উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছে।

বান্দরবানে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক দুই জুম্ম পরিবার সর্বস্বান্ত

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন লামা উপজেলার বাসিন্দা (১) চিংহ্লা প্রু মারমা, পীং- সুইংবাইঅং মারমা ও (২) মং মং চিং মারমা, পীং- চিংহ্লা প্রু মারমা, সর্বসাং- শিলেরতুয়া মারমা পাড়া, দীর্ঘ বৎসর ধরে ২৯৩ নং ছাগলনাইয়া মৌজার ১৭৫ নং খতিয়ানে ৪.৫০ একর, ১২২ নং খতিয়ানে ৩.০০ একর ও ১২৩ নং খতিয়ানে ৪.০০ একর সর্বমোট ১১.৫০ একর ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণীর জমি পিতামহের আমল হতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। এতে তারা মৎস্য চাষ ও বাগান-বাগিচা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি (১) আবুল কালাম, পীং- রেজাউল হক, (২) জাহানারা বেগম, স্বামী- শফি আলম, (৩) রোকেয়া বেগম, স্বামী- ঐ, (৪) নাজিম মিয়া, পীং- অজ্ঞাত, (৫) মোঃ ইব্রাহীম, পীং- গোলাম মোস্তফা, (৬) গোলাম মোস্তফা, পীং- আবদুর রহমান, সর্বসাং- শিলেরতুয়া, ২৯৩ ছাগলনাইয়া মৌজাসহ সর্বমোট ১৪ টি বহিরাগত পরিবার জবরদখল করে উক্ত দুই পরিবারের ভূমির উপর পরিকল্পিতভাবে বসতিস্থাপন শুরু করেছে। বেআইনীভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে উক্ত দুই জুম্ম পরিবারের মৎস্য খামার ও ফলজ বাগান ভোগদখল শুরু করেছে। চিংহ্লা প্রু মারমা ও মংমং চিং মারমা লামার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বান্দরবান জেলা প্রশাসকের নিকট একাধিকবার সুবিচার চেয়ে আবেদন-নিবেদন করলেও কোন ধরনের প্রতিকার পাচ্ছেন না। ফলে তারা বর্তমানে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন করছেন। ♦

বিশেষ প্রতিবেদন

কাপ্তাইয়ে কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে অতর্কিতে বর্বরোচিত পুলিশী হামলা, চাঁদাবাজি ও লুটপাট

গত ২ নভেম্বর ২০০৬ রাত আনুমানিক ১:০০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের অন্তর্গত মুরালীপাড়া ধর্মরক্ষিত বৌদ্ধ বিহারে আয়োজিত অন্যতম বৃহৎ বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে অতর্কিতে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে কাপ্তাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আসাদের নেতৃত্বে একদল অবিবেচক পুলিশ। হামলায় তারা অনুষ্ঠানস্থলে অস্থায়ী দোকানগুলোর উপর লুটপাট, অংশগ্রহণকারী জুম্ম জনতার উপর বেপরোয়া মারধর ও নারীদের উপর অশালীন অত্যাচার চালিয়েছে। এতে বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহতও হয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ সময় এলাকার 'কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত স্থানে জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানস্থলে কয়েকটি ছোট ছোট অস্থায়ী দোকানও বসানো হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি বা বিহারের কোন কর্মকর্তাকে কোন অবগতি ব্যতিরেকেই উপরোক্ত পুলিশ সদস্যরা হঠাৎ উক্ত অস্থায়ী দোকানীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা দাবী করে বসে। ছোট ও অস্থায়ী দোকান বিধায় দোকানদাররা চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে পুলিশ সাথে সাথে দোকানীদের উপর চড়াও হয় এবং রাইফেলের বাট দিয়ে মারপিট শুরু করে। সেখানে উপস্থিত উৎসুক মানুষ সেব্যাপারে জানতে চাইলে পুলিশ অনুষ্ঠানে সমাগত সাধারণ মানুষের উপরও চড়াও হয় এবং রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে। এমনকী আগত নারী, মা-বোনদের উপরও পুলিশ হাত তুলে এবং স্পর্শকাতর ও আপত্তিকর স্থানে হাত তুলে অশালীন অত্যাচার চালায়। এসময় পুলিশের এই তাৎক্ষণিক তান্ডবতা প্রত্যক্ষ করে সাধারণ নারী-পুরুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাঁচাও বাঁচাও রবে দিকবিদিক ছুটোছুটি করে, কেউ হুমড়ি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এই ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান অংহাচিং মারমা ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে রক্তাক্ত আহত ব্যক্তিরা চেয়ারম্যানকে জড়িয়ে ধরে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে। পরে ঘটনাটি অবগত করার জন্য এবং পরিস্থিতি শান্ত করার নিমিত্তে পার্শ্ববর্তী কুকিমারা বিডিআর ক্যাম্পের কম্যান্ডার জনাব মোঃ সালামকে খবর দেয়া হয়। এক পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সমন্বয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। এই পুলিশী হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন-

১) সুইহ্লাচিং মারমা (২৭), পীং- মে অং মারমা, সাং- মুরালীপাড়া;
২) তপন মারমা, পীং- চিং থোয়াই মারমা, সাং- মুরালীপাড়া;
৩) অংসাপ্রু মারমা (২৫), পীং- চিংসাখই মারমা, সাং- মুরালীপাড়া;
৪) মিস এচিং মারমা (২২), পীং- মৃত মংচাই মারমা, সাং- মুরালীপাড়া;
৫) মিস ক্রাথুইচিং মার্মা (২০), পীং- ক্য থোয়াই মারমা, সাং- মুরালীপাড়া;
৬) মিস স্বপ্না চাকমা (২০), পীং- অজ্ঞাত, সাং- ঘাগড়া;
৭) মিস ক্রাজো মারমা (১৮), পীং- কংগ্য মারমা, সাং- ধর্মগোদা এলাকা।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে ঘাগড়ার বিভিন্ন ফার্মেসীতে এবং কাপ্তাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া হামলার সময় পুলিশ দোকানীদের কাছ থেকে নগদ প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে দোকানীরা অভিযোগ করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন ওয়াগ্গা ইউনিয়নের মুরালীপাড়ার মং ম্রাখ্যাই মারমা (২০) ও হ্লাথোয়াইচিং মারমা (২৫)। এছাড়া পুলিশ ডেকোরেশন কর্মীদের মারধরসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্রায় ৩০টি টিউবলাইট ভাঙচুর করেছে বলে জানা যায়।

এদিকে এই ঘটনার পর স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার ও কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটি নেতৃবৃন্দসহ এলাকাবাসী গণস্বাক্ষর করে কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। ♦

সংবাদ প্রবাহ

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ কর্তৃক শিশু ও বৃদ্ধ খুন

গত ১ আগষ্ট ২০০৬ রাত প্রায় ৮:৩০ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন গুইমারা রবীন্দ্র কার্বারী পাড়ায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা তুপারায় ত্রিপুরা (৭০) ও গোলাপী বিকাশ ত্রিপুরা (১১) নামের ২ নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করেছে। নিহত তুপারাম (তুপারায়) ত্রিপুরা ও গোলাপী বিকাশ ত্রিপুরা আত্মীয় সম্পর্কে আপন নানা ও নাতি। জানা যায়, ঐদিন রাত প্রায় ৮:০০ টায় ইউপিডিএফ-এর একদল সন্ত্রাসী তুপারাম ত্রিপুরার বাড়ী যায় এবং এরপর বাড়ীর বেড়া কেটে বাড়ীতে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই উক্ত নানা-নাতি খুন হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ এ ব্যাপারে কলিতা মোহন ত্রিপুরা (৩০) ও রফিন্দ্র ত্রিপুরা (২৫)কে গ্রেফতার করেছে এবং গুইমারা থানায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাঘাইছড়িতে সেনাসদস্যদের কর্তৃক ইউপি সদস্য ও স্কুল শিক্ষক গ্রেফতার

গত ২ আগষ্ট ২০০৬ রাত আনুমানিক ২:০০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মাহাবুবের নেতৃত্বে একদল সেনাসদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলার বারবিন্দুঘাট এলাকায় তথাকথিত অভিযান চালিয়ে মারিশ্যা ইউপি-র ১নং ওয়ার্ড সদস্য সুমন চাকমা (৩৫) ও রূপালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রগতি চাকমা (৩২)কে গ্রেফতার করেছে। পরে সেনাসদস্যরা অস্ত্র ব্যবসার সাথে জড়িত করে এবং ৯ রাউন্ড রাইফেলের গুলি পাওয়া গেছে বলে সাজানো অভিযোগ দাঁড় করিয়ে উক্ত ইউপি সদস্য সুমন চাকমা ও শিক্ষক প্রগতি চাকমাকে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। বাড়ী তল্লাশী ও গ্রেফতার কালে সেনাসদস্যরা বাড়ী থেকে ৬ ভরি স্বর্ণ, ৬টি আংটি, ৫ জোড়া কানের ঢোল, ১ ভরি হাতের বালা, ৪টি হাত ঘরি ও নগদ ৪০,১৭০ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন গ্রেফতারকৃত ইউপি সদস্যর স্ত্রী বিদুষী চাকমা। আটক ২ জনের মুক্তির দাবীতে গত ৩ আগষ্ট ২০০৬ এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল করেছে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। গ্রেফতারের কয়েকদিন পর সুমন চাকমা ও প্রগতি চাকমা আদালত থেকে জামিন লাভ করে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক বৌদ্ধবিহারে অগ্নিসংযোগ

গত ৮ আগষ্ট ২০০৬, দুপুর প্রায় ১২:৩০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলাধীন ৫নং ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নের ৫নং চাইল্যাতলী মৌজার বহিরাগত সেটেলার বাঙালী পাড়ার রফিক উদ্দিন পীং- আবদুল বারেক্ এর নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের সেটেলার বাঙালীদের একটি দল চাইল্যাতলী বৌদ্ধ বিহারটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ধর্মীয় অবমাননা ও বৌদ্ধ বিহার এলাকাসহ আশেপাশের জায়গা-জমি বেদখল করার উদ্দেশ্যেই সেটেলার বাঙালীরা এই ঘটনা ঘটায়। জানা যায়, প্রথমে গত ৬ আগষ্ট ২০০৬ উক্ত রফিক উদ্দিনের নেতৃত্বে বহিরাগত সেটেলার বাঙালীরা চাইল্যাতলী বৌদ্ধ বিহারটি ভেঙে দেয় এবং বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশের জায়গা পরিষ্কার করে। এর পরের দিন ৭ আগষ্ট ২০০৬ চাইল্যাতলী মৌজার হেডম্যান বিন্দুময় দ্রুত জায়গা জবরদখল বন্ধকরণ এবং বিহার ধ্বংসকারী ও জায়গা জবরদখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রফিক উদ্দিন, পীং আবদুল বারেকসহ তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন জানান। আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। তদন্ত কমিটির সদস্যরা হল- (১) জনাব নুরুচ্ছাফা, চেয়ারম্যান, ৫নং ভাসন্যা আদাম ইউপি, (২) সুখময় চাকমা, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, (৩) থানা পুলিশ প্রতিনিধি, (৪) চাইল্যাতলী বিডিআর ক্যাম্পের কমান্ডার ও (৫) স্থানীয় কানুনগো।

তদন্ত কমিটি গঠন করার পরের দিনই ৮ আগষ্ট ২০০৬, দুপুর প্রায় ১২:৩০ টায় উল্লেখিত রফিক উদ্দিনের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালীরা আবার বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার করে এবং এক পর্যায়ে বিহারটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। বিহারে অগ্নিসংযোগের সময় স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলের পাশেই টহলরত ছিল বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় বিন্দুময় হেডম্যানকে বাদী করে থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করা হয়। অভিযোগ দেয়ার পরপরই থানা হতে ১০/১২ জনের একটি পুলিশ দলসহ স্থানীয় ৭নং ইউপি চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির থানা শাখার সদস্য অশোক কুমার চাকমা ঘটনাস্থলে যান এবং আলামত হিসেবে পোড়া বিহারের কিছু ছাই নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রীর আর্থিক অনুদানেই উক্ত বিহারটি নির্মাণ করা হয়। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ উক্ত ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রফিক উদ্দিনসহ অন্য কাউকে এখনও গ্রেফতার করেনি।

লংগদুতে বিডিআর কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারে তল্লাশী

গত ৯ আগষ্ট ২০০৬ দুপুর প্রায় ১২:৩০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার কাঠালতলী বিডিআর ক্যাম্পের কমান্ডার আইনুল এর নেতৃত্বে ১৮/১৯ সদস্য বিশিষ্ট বিডিআর ও আনসারের একটি দল স্থানীয় রঞ্জিতপাড়া ভাবনা কুঠির বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে

ধর্মীয় রীতিকে উপেক্ষা করে জুতা পায়ে প্রবেশ করে এবং হয়রানিমূলকভাবে বিহারে তল্লাশী চালায়। এমনকি বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুর সাথেও অসৌজন্যমূলক আচরণ করে।

জুরাছড়িতে বিডিআর এর নতুন ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা

গত ১৭ আগষ্ট ২০০৬ বিডিআর একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপনের জন্য রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলাধীন বগাখালী নুয়া বাজারের পাশ্ববর্তী একটি জায়গা নির্বাচন করেছে। জানা যায়, জুরাছড়ি উপজেলার গন্ডাছড়া বিডিআর ক্যাম্পের জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে একদল বিডিআর এর সদস্য ক্যাম্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত বগাখালী নুয়া বাজার পরিদর্শন করে। গন্ডাছড়া বিডিআর ক্যাম্প হতে বগাখালী নুয়া বাজারের দুরত্ব ১২ কিলোমিটার। উল্লেখ, সেখানে ইতিমধ্যে কয়েকটি সেনাক্যাম্প রয়েছে। তাই এটি নতুন করে সেনাক্যাম্প সম্প্রসারণ ও সেটেলার পুনর্বাসনের পদক্ষেপ বলে এলাকাবাসীর আশংকা।

বরকলে বিডিআর কর্তৃক এক জুম্ম তরুণীর শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা

গত ২২ আগষ্ট ২০০৬ রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন বরকল উপজেলার ফালিটাঙ্যাচুক বিডিআর ক্যাম্পের দুই বিডিআর সদস্য বজলু ও মজনু ফালিটাঙ্যাচুক গ্রামের অধিবাসী সমপুদি চাকমা (১৬), পীং রাজমঙ্গল চাকমা অংলা নামের এক জুম্ম তরুণীর শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা চালায়। জানা যায়, ঐদিন দুপুর প্রায় ২:০০ টায় উক্ত সমপুদি চাকমা নিজেদের গরুগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য পার্শ্ববর্তী ঝিরিতে যায়। এ সময় উক্ত বজলু ও মজনু সেদিকে পানি আনতে যায় এবং সমপুদি চাকমাকে একা পেয়ে বজলু ঝাঁপটে ধরার চেষ্টা করে। এতে সমপুদি চাকমা ভয়ে চিৎকার করলে পাশ্ববর্তী বাড়ী হতে মনুমোহন চাকমা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। মনুমোহন চাকমা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। এদিকে এলাকায় ঘটনাটি জানাজানি হলে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হলে উক্ত বিডিআর ক্যাম্পের কমান্ডার হাবিলদার হাবিব ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য সমপুদি চাকমা ও তার মাকে ২০০ টাকা করে ৪০০ টাকা দিয়ে এ ব্যাপারে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়। তবে এর পরে উক্ত বজলু ও মজনুকে ফালিটাঙ্যাচুক ক্যাম্প হতে বরকল সদরে বিডিআর জোনে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফালিটাঙ্যাচুক বৌদ্ধ বিহারের জায়গা জবরদখল করে উক্ত বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এলাকাবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ক্যাম্পটি প্রত্যাহার করা হয়নি।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ এর গুলিতে এক যুবক খুন

গত ২২ আগষ্ট ২০০৬ সকাল আনুমানিক ৭:০০ টায় ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার ছোট পানছড়ি পাড়ার কার্বারীর বাড়ি ঘেরাও করে। এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ সদস্যরা পানছড়ির উপজেলাধীন লতিবান ইউনিয়নের ঝাগুনালা গ্রামের স্বপন জ্যোতি চাকমা (২২), পীং শুণোসিন্ধু চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। স্বপন জ্যোতি চাকমা এ সময় কয়েকদিন ধরে অসুস্থ তার মায়ের জন্য ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল।

নানিয়ারচরে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সম-অধিকার আন্দোলনের সভা

গত আগষ্ট মাসে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলায় নানিয়ারচর সেনা জোনের বিদায়ী জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল মোঃ ফজলু হক ও নবনিযুক্ত জোন কমান্ডার এর সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালীদের মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক সংগঠন সম-অধিকার আন্দোলন আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় তারা সৈয়দ আলীকে সভাপতি ও সালামকে সম্পাদক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। সভায় তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম জোরদারের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে। বিশেষ করে আসন্ন ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এবং জনসংহতি সমিতিকে বিরোধীতার জন্যই সেটেলার বাঙালীদের সংগঠিত করতে এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে।

মহালছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ইউপি চেয়ারম্যান আটক

গত ২৩ আগষ্ট ২০০৬ বিজিতলা সেনা জোনের সদস্যরা খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে ফেরার পথে মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাজাই মারমাকে তুলে রাখে। তাকে মারাত্মকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং মহালছড়ি সেনা জোনের কমান্ডার লে. কর্ণেল কাজী সামছুল হক ও বিজিতলা সাব-জোনের কমান্ডার মেজর রশিদ কর্তৃক হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে ঐ দিন রাত প্রায় ১১:০০ টায় সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে চেয়ারম্যান সাজাই মারমাকে ছেড়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, চেয়ারম্যান সাজাই মারমা ইতিমধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নে আবার সেটেলারদের বসতি সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং প্রতিবাদ করেছিলেন।

রাঙামাটি সরকারী কলেজে ছাত্রদলের ক্যাডারদের হামলায় জুম্ম ছাত্র আহত

গত ২৪ আগষ্ট ২০০৬ বিএনপি-র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডাররা রাঙামাটি সরকারী কলেজে জুম্ম ছাত্রদের উপর হামলা চালিয়েছে। ঐ দিন বিএনপির সমর্থক কতিপয় বাঙালী কলেজ ক্যাম্পাসে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার নামে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে শ্লোগান তুলে। কলেজের কিছু জুম্ম ছাত্র শ্লোগান প্রদানকারীদের অশালীন ভাষা ব্যবহার না করার অনুরোধ জানায়। আর এটাই সহ্য করতে না পেরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাডাররা নির্বিচারে জুম্ম ছাত্রদের উপর হামলা

চালিয়েছে। এতে (১) রমেল চাকমা (১৮), পীং প্রেমেন্দ্র চাকমা, এইচ এস সি ও (২) গৌতম চাকমা (১৮), এইচ এস সি মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং পরে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৫ গ্রামবাসী আহত

গত ২৬ আগষ্ট ২০০৬ বিকাল প্রায় ৬:৪৫ টায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা হঠাৎ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন গুইমারা উপজেলার চেয়ারম্যান টিলার দেওয়ানপাড়া নামক স্থানে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। এতে ৫ নিরীহ গ্রামবাসী মারাত্মক আহত হয় এবং অবশেষে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আহত গ্রামবাসীরা হলেন ১. দয়া চাকমা (২৮), পীং অজ্ঞাত, সাং- কৈলাশ মহাজন পাড়া, ২ নং দুল্যাতলী ইউপি, লক্ষীছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি; ২. নাইংডা মারমা (২৫), পীং হ্লাপা অং মারমা, সাং- মাগরাছড়ি, ২ নং দুল্যাতলী ইউপি, লক্ষীছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি; ৩. সাথোয়াই মারমা (৩৫), পীং মংরি মারমা, সাং- গুইমারা, খাগড়াছড়ি; ৪. উপেন্দ্র ত্রিপুরা (৪২), পীং পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা, সাং- বাল্যাছড়ি, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি ; ৫. সুইচিং মারমা (২৭), পীং অজ্ঞাত, সাং- চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই উপজেলা, রাঙ্গামাটি;

বাঘাইছড়িতে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক এক শিশু ধর্ষিত

গত ২৭ আগষ্ট ২০০৬ বেলা আনুমানিক ২:০০ টায় রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের পাক্কোয়াখালী গ্রামের ১০ বছর বয়সের সেবিকা চাকমা, পীং উদয়ন চাকমা নামের এক জুম্ম শিশু একই উপজেলার চুরাখালী গ্রামের মোঃ বিল্লাল (২৬), পীং কাসেম নামের এক সেটেলার বাঙালী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায়, ঐ সময় সেবিকা চাকমাকে বাড়ীতে একা পেয়ে মোঃ বেল্লাল এই পাশবিক ঘটনা ঘটায়।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ক্রাউসং মারমা আহত

গত ২৯ আগষ্ট ২০০৬ রাত প্রায় ১০:০০ টায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র একটি দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী মৌজায় নিজের দোকানে অবস্থানকারী ক্রাউসং মারমা (২২), পীং সাথোয়াই মারমার উপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ শুরু করে। এতে সন্ত্রাসীরা ক্রাউসং মারমাকে মারাত্মক আহত করে পালিয়ে যায়। পরে মারাত্মক আহত ক্রাউসং মারমাকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, ক্রাউসং মারমার দোকানের পাশেই একটি সেনাক্যাম্প থাকা সত্বেও সেনা সদস্যরা তাকে রক্ষা করতে এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক ছাত্রনেতা অপহরণ, পরে মুক্তি

গত ৩১ আগষ্ট ২০০৬ ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সদস্যরা খাগড়াছড়ি স্টেডিয়াম থেকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার কৃষি গবেষণা এলাকার প্রতাপ কার্বারী পাড়ার সোহেল দেওয়ান (১৯), পীং খুকুমনি দেওয়ানকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে। এ সময় সোহেল দেওয়ান স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখছিল। সে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদর উপজেলা শাখার অর্থ সম্পাদক। এরপর দিন ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ অপহরণকারীরা সোহেল দেওয়ানকে মুক্তি দেয়।

রামগড় ও মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র তৎপরতা

গত আগষ্ট মাসে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার মত রামগড় ও মানিকছড়ি এলাকায়ও সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে নানা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দেয়া হলঃ

১। গত ৭ আগষ্ট ২০০৬ রাত আনুমানিক ৮:০০ টায় হুইলনালী (ফকিরনালা), মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি নিবাসী নেন্দা মারমা (২৮), পীং অজ্ঞাত-কে তার নিজ বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ সদস্যরা অস্ত্রের মুখে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। এতে ৭/৮ জনের এই ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসী দলে নেতৃত্ব দেয় উজ্জ্বল মারমা।

২। ৮ আগষ্ট ২০০৬ দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টায় ১০/১২ জনের ইউপিডিএফ এর একটি সন্ত্রাসী দল রামগড় উপজেলার পিলাকপাড়া ও পদাছড়া সাধন বিলাস কার্বারী পাড়ায় হামলা চালিয়ে ৩ পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। উক্ত ৩টি পরিবার হল-

১) [illegible] চাকমা (৫৬), পীং নীলকুমার চাকমা, সাং- পিলাকপাড়া (ছনখোলা পাড়া), হাফছড়ি ইউপি;
২) [illegible] চাকমা (২৫), পীং দেবরঞ্জন চাকমা, সাং- ঐ
৩) [illegible] চাকমা (৩০), পীং ভিনঞ্জয় চাকমা, সাং- পদাছড়া সাধন কার্বারী পাড়া, রামগড়।

উক্ত তিনটি পরিবারই বর্তমানে মানিকছড়ি সদরে অবস্থান করছে।

৩। গত ১৬ আগষ্ট ২০০৬ সকাল আনুমানিক ৬:০০ টায় ইউপিডিএফ এর একটি সশস্ত্র দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলাধীন হাফছড়ি ইউনিয়নের উয়কছড়ি (বটতলা) গ্রামবাসী হানিমং মারমা (৪০), পীং রুইধং মারমাকে তার নিজ বাড়ি থেকে বাইরে উঠানে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

৪। ১৮ আগষ্ট ২০০৬ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় একদল ইউপিডিএফ সদস্য মানিকছড়ি উপজেলা সদরে রাজপাড়ায় ঢুকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের তল্লাশী চালায়। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের না পেয়ে লুটপাট চালানোর চেষ্টা চালালে গ্রামের লোকেরা বাঁধা দেয়। পরে মানিকছড়ি মারমা উন্নয়ন সংসদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্রাশ ফায়ার করে পালিয়ে যায়। এই ইউপিডিএফ সদস্যদের মধ্যে যাদেরকে চিহ্নিত করা গেছে তারা হল-

১) রতনবসু মারমা ওরফে জয় (৩০), পীং দুলালবসু মারমা, গ্রাম- মংপ্রুতলী, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি;
২) সুইচিং মারমা ওরফে মাইকেল (২৮), পীং দুলালবসু মারমা, গ্রাম- মংপ্রুতলী, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি;
৩) সুইথুই মারমা (২৬), পীং দুলালবসু মারমা, গ্রাম- মংপ্রুতলী, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি;
৪) উষামং মারমা ওরফে উজ্জ্বল (৩০), পীং নিংপ্রু মারমা, সাং- ছোট পিলাকপাড়া;
৫) মহন্যা চাকমা (৩০) পীং ভালুক্যা চাকমা, সাং- মহিষখালী দুজরী, মানিকছড়ি।

দুস্কৃতিকারী কর্তৃক এক জুম্ম কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার শিকার

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন ছোট মেরুং ইউনিয়নের ৫৫ নং ছোট হাজাছড়া মৌজার অঙ্গনা রঞ্জন মাস্টার পাড়ার রুনা চাকমা (১৫), পীং জ্ঞানজ্যোতি চাকমা নামের এক জুম্ম কিশোরী দীঘিনালা উপজেলার ছোট মেরুং এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যার শিকার হয়। সে দীঘিনালা উপজেলার ছোট মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

জানা যায়, ঐ দিন রুনা চাকমা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পাশ্ববর্তী ছোট মেরুং উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়। কিন্তু সেদিন সে আর অন্যান্য দিনের মত বাড়ী ফিরে আসেনি। এর পরের দিন ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খুব ভোরে খোঁজাখুঁজি শুরু হলে সকাল প্রায় ৬:৩০ টায় বড় মেরুং স্টীল ব্রীজ থেকে আধা কিলোমিটার দূরে ১০ নং আনসার সেন্ট্রি পোস্টের পার্শ্ববর্তী মেরুং ছড়ার পাশে রুনা চাকমার লাশ উলঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়। স্থানীয়রা সন্দেহ করছেন যে, পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালীদের কেউ ধর্ষণের পর রুনা চাকমাকে হত্যা করেছে। ঘটনার পর অভিভাবকের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, এরপর পুলিশ ৬ জন বাঙালীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হল ১. মনোয়ার (২৫), পীং- মোঃ জয়নাল, সাং- খেজুরবাগান, মেরুং, দীঘিনালা; ২. মোঃ নুরু (৩৫), পীং- একেন আলী ফকির, সাং- বড় মেরুং (স্থানীয় আওয়ামীলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট); ৩. রাসেল (২৫), পীং- অজ্ঞাত, সাং- মেরুং; ৪. নজরুল (৩৫), পীং- মোঃ জালাল, সাং- মেরুং; ৫. আলমগীর (২৫), পীং- মোহাম্মদ আলী, সাং- মেরুং; ৬. হায়দার (৩০), পীং- অজ্ঞাত, সাং- মেরুং।

তবে এর পরে শেষের ৩ জনকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে এবং বাকী ৩ জনকে রিমান্ডে পাঠিয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পরপরই চতুর্দিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। নিখোঁজ হওয়ার দিনেই বিকেলে দীঘিনালা থানার পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তির দাবী জানায়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখেও দীঘিনালা সদর থানায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক এবং স্থানীয় জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬ দীঘিনালা বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়কে শোকর‍্যালী এবং শেষে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে দীঘিনালা প্রেসক্লাব, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও কলেজ কর্তৃপক্ষ একাত্মতা ঘোষণা করে। সমাবেশ শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়। এছাড়া ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খাগড়াছড়ি জেলা সদরে শিক্ষক ও ছাত্রদের অংশগ্রহণে এ ব্যাপারে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ২ জন নিহত ও ১ জন অপহৃত

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সকাল প্রায় ৮:০০ টায় ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র একটি দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি সদর ইউনিয়নের চইক্যাবিল পাড়ার ধর্মঘর বটতলা নামক স্থানে স্থানীয় মানিকছড়ি বাজারে আগত নিরীহ জনগণের উপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। এতে ঘটনাস্থলে মংপ্রু মারমা (৩৫), পীং- সুদু অং মারমা, সাং- দক্ষিণ হাফছড়ি নিহত এবং পাগালা চাকমা, পীং- অজ্ঞাত, সাং- জুরোমনি কার্বারী পাড়া মারাত্মক আহত হন। পরে চট্টগ্রামে নিয়ে যাবার পথে আহত পাগালা চাকমাও মারা যান। এছাড়া ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা একই স্থান থেকে অংসে প্রু মারমা (৩০), পীং- বলিচাই কার্বারী, সাং- দিল্যাতলী, লক্ষীছড়িকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। জানা যায়, রতন বসু মারমা (৩০), পীং- দুলাল বসু মারমা, সাং-

মংপ্রু তলী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এর নেতৃত্বে ১৫ হতে ২০ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র দলটি প্রথমে বাজারে আগত ৮০/৯০ জন গ্রামবাসীকে উপরোল্লিখিত স্থানে একত্রিত করে। এরপর ইউপিডিএফ সদস্যরা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে আসা মালামালের ট্যাক্স হিসেবে চাঁদা দাবী করে। গ্রামবাসীরা যখন চাঁদা দিতে অস্বীকার করে তখন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। মানিকছড়ি থানায় এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ১ ব্যক্তি খুন

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ টায় রতন বসু মারমা (৩০), পীং- দুলাল বসু মারমা, সাং- মংপ্রুতলী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি-র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র একটি দল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন গুইমারা-রামগড় এলাকার উত্তর হাফছড়ি গ্রামের নিংপ্রু চাই মারমা (৩০), পীং- বেলা মারমাকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে উঠানে এনে গুলি করে হত্যা করে।

গুইমারায় ইউপিডিএফ কর্তৃক এক যুবক খুন

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ রিগেন চাকমা ও জিগিনাথ ত্রিপুরার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র ক্যাডারদের কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গুইমারা এলাকার হিরণ কার্বারী পাড়ার নির্মল কান্তি চাকমা (২১), পীং- মৃত হেমেন্দ্র ত্রিপুরা নামের এক নিরীহ যুবককে গুলি করে হত্যা করে। ইউপিডিএফ দুস্কৃতিকারীদের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনগণ পুলিশকে না জানিয়েই নির্মল কান্তি ত্রিপুরার লাশ সৎকার করে।

বাঙ্গালহালিয়ায় এক জুম্ম বালিকা ধর্ষিত

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বিকাল আনুমানিক ৪:০০ টায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের ম্রোডং পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ১১ বছরের বালিকা নিমা মারমা, পীং- উচিংমং মারমা, মাতা- মেতুং মারমা প্রতিবেশী এক বাঙালী সন্তোষ দাশ (৩৭), পীং- মৃত মনমোহন দাশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায়, উক্ত সন্তোষ দাশ প্রথমে টাকা ও চানাচুর এর প্রলোভন দেখিয়ে অবুঝ বালিকাটিকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে ধর্ষণ করে। পরে পুলিশ অভিযুক্ত ধর্ষক সন্তোষ দাশকে গ্রেফতার করে।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ কর্তৃক ৮ ব্যক্তিকে অপহরণ, পরে ৪ জনের মুক্তি

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বগাপাড়া এলাকা থেকে ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ৮ নিরীহ ব্যক্তিকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। পরে এদের মধ্যে ৪ জনকে নানা হয়রানির পর ছেড়ে দিয়েছে। জানা যায়, ঐদিন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত বেশ কিছু গ্রামবাসী মাটিরাঙ্গা উপজেলার বগাপাড়া এলাকা নিবাসী ফনি ভূষণ চাকমার বাড়ীতে টেলিভিশন দেখতে যায়। গ্রামবাসীরা যখন টেলিভিশন দেখছিল তখন সন্ধ্যা ৭:০০ টায় ১৫/২০ জনের ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র একটি দল অতর্কিতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে আসা মাত্রই ইউপিডিএফ এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে ৮ জনকে ধরে নিয়ে যায়। ধৃত ব্যক্তিরা হল ১. দে ব্রত চাকমা ওরফে তপন (৪৫), পীং সুরেন্দ্র লাল কার্বারী, সাং- বগাপাড়া, তাইন্দং, মাটিরাঙ্গা, ২. ফনিভূষণ চাকমা (৩৫), পীং সুরেন্দ্র লাল কার্বারী, সাং- বগাপাড়া, তাইন্দং, মাটিরাঙ্গা, ৩. বকুল কান্তি চাকমা (৩৫), পীং রবীন্দ্র লাল চাকমা, সাং- ঐ; ৪. সুপায়ন চাকমা (২৮), পীং জ্ঞানরঞ্জন চাকমা, সাং- ঐ; ৫. বিশ্বম্বর চাকমা (৩৮), পীং নোয়ারাম চাকমা, সাং- সর্বশ্বর পাড়া, মাটিরাঙ্গা; ৬. কুমজ্যা চাকমা (৩০), পীং কাল্যা চাকমা, গ্রাম- পেরাছড়া, গাছবান; ৭. কাল্যা চাকমা ওরফে অনুপম (৪৩), পীং রজনী চাকমা, সাং- লতিবান, পানছড়ি ; ৮. যুগবিন্দু চাকমা ওরফে দর্শন (৪০), পীং রাঙাচান চাকমা, সাং- নালকাটা, পানছড়ি। অপহরণের ২ দিন পর গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ বিকেল বেলায় সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের মধ্য থেকে বকুল কান্তি চাকমা, সুপায়ন চাকমা, বিশ্বম্বর চাকমা ও কুমজ্যা চাকমাকে ছেড়ে দেয়। বাকীরা এখনো ছাড়া পায়নি। সশস্ত্র ইউপিডিএফ এর সন্ত্রাসীদের মধ্যে যাদেরকে চিহ্নিত করা গেছে তারা হল ১. শ্যামল চাকমা ওরফে জোলেইয়্যা (৩২), পীং ইন্দ্রমোহন চাকমা, সাং- নাপিতা পাড়া (গোলক পুতিমা থুম), পানছড়ি; ২. বিনয় প্রকাশ চাকমা ওরফে রাহুল, পীং মনিন্দ্র চাকমা, সাং- চন্দ্রনাথ চেয়ারম্যান পাড়া, লতিবান, পানছড়ি; ৩. সমাজপ্রিয় চাকমা, পীং জ্ঞানরঞ্জন চাকমা, সাং- ধুধুকছড়া, পানছড়ি; ৪. সন্তোষ চাকমা, পীং জ্যোতি মোহন চাকমা, সাং- নলীন্দ্র কার্বারী পাড়া, ছোট পানছড়ি; ৫. বিপিন বিহারী চাকমা ওরফে জাল্যা, পীং প্রাণহরি চাকমা, সাং- করল্যাছড়ি মুখ, কিয়াংঘাট, মহালছড়ি উপজেলা।

বান্দরবানে সেটেলার বাঙালী কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৭ অক্টোবর ২০০৬ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় বান্দরবানে একদল দুস্কৃতিকারী সেটেলার বাঙালী দুই মারমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এসময় উক্ত মারমা মহিলারা তাদের স্বামীসহ বান্দরবান জেলা সদরে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের পর বাড়িতে ফিরছিল। জানা যায়, বান্দরবান সদরের লউঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা মিসেস উমেচিং মারমা, স্বামী- সা অংপ্রু মারমাকে সাথে নিয়ে বান্দরবান পৌরসভার ইসলামপুর এলাকায় পৌঁছলে উক্ত বাঙালী দুস্কৃতিকারীরা তাকে পথরোধ করে। এরপর দুস্কৃতিকারীরা

উমেচিং এর স্বামী সা অংপ্রু মারমাকে লাথি-ঘুষি মেরে টেনেহেচড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায়। অপরদিকে দুস্কৃতিকারীদের কয়েকজন ধর্ষণের উদ্দেশ্যে উমেচিং মারমার পরনের কাপড়চোপড় খুলে দেয়। তবে ঘটনার সাথে সাথে আক্রান্তরা চিৎকার জুড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আক্রান্তদের উদ্ধার করে। এই ঘটনার পাশাপাশি মিসেস শৈঅং চিং মারমা ও তার স্বামী উচাইন মারমাও একই কারণে দুস্কৃতিকারী বাঙালীদের কর্তৃক আক্রমনের শিকার হন এবং স্থানীয়দের দ্বারা উদ্ধার পান। এই আক্রমনে বাবুল মারমা, পীং- উক্যচিং মারমা মাথায় আঘাত পায় এবং তাকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উমেচিং মারমা উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে বান্দরবান থানায় মামলা দায়ের করেন। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেছে বলে জানা যায়নি। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত দুস্কৃতিকারীরা হল বান্দরবান পৌরসভার ইসলামপুর গ্রামের ১. কাজল দাশ, পীং সাধন দাশ, ২. রুল আমিন, পীং নুরু, ৩. হারুণ, পীং আব্দুর রহমান, ৪. মোঃ ফরিদ, পীং শামসু, ৫. সোলেমান, পীং অজ্ঞাত, ৬. সৈয়দ হোসেন, পীং অজ্ঞাত, ৭. জাহাঙ্গীর, পীং মাখন, ৮. সেলিম, পীং অজ্ঞাত (চায়ের দোকানদার), ৯. লেদু, পীং আবুল কালাম।

বান্দরবানে ম্রো আদিবাসী খুন

গত ৭ অক্টোবর ২০০৬ রাত্রে বান্দরবান পার্বত্য জেলার সদর থানাধীন টংকাবাড়ি ইউনিয়নের আদিবাসী রিংরং ম্রো (৮০) ওরফে নিয়ারিং ম্রো, পীং- মৃত মকলু ম্রো দুস্কৃতিকারী কর্তৃক খুন হয়েছেন। জানা যায়, রিংরং ম্রো দীর্ঘদিন ধরে তার গ্রামের পার্শ্ববর্তী আধাকিলোমিটার দুরত্বে একটি মুদির দোকানে ব্যবসা করে আসছিলেন। প্রতিদিনের ন্যায় ঐদিনও তিনি দোকানে রাত্রীযাপন করেন। উক্ত তারিখে সকালে গ্রামের লোকেরা দোকানে দেখতে পায় যে, দোকানের সামগ্রী তছনছ এবং রিংরং ম্রোর গলা কাটা ও বুকে ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় লাশ পড়ে আছে। এলাকাবাসীর ধারণা, পার্শ্ববর্তী বহিরাগত সন্ত্রাসীরা টংকাবতী ইউনিয়নের ম্রোদেরকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে এই খুনের ঘটনা ঘটায়। বর্তমানে ঐ ইউনিয়নের ৩৭ টি গ্রামের ৬১২ টি ম্রো পরিবার আতঙ্কে দিনযাপন করছে। ♦

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে
তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে
থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না,
পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন
অধিকার থাকতে পারে না।"

- এম এন লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়
কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ১০ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রকাশিত ও প্রচারিত

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা মাত্র

JUMMA SAMBAD BULLETIN
Newsletter of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)
Issue No-37, 16 th Year, 10 November 2006

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office,
Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone & Fax : +880-351-61248
E-mail: pcjss@hotmail.com, pcjss@gmail.com

Website: www.pcjss.org

Price : Tk. 35.00 Only